# শান্তি।

শ্রী-দামোদর-মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

১৩০৯।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

PRINTED & PUBLISHED BY

Kunja Bihari De

AT THE

**Hara sundara Press**

*98 Harrison Road, Calcutta.*

# বিজ্ঞাপন।

হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ ব্যক্তিবৃন্দকে বিনোদিত করিবার অভিপ্রায়ে, এই গ্রন্থ লিখিত হইল।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মে ও সুপবিত্র আর্য্য শাস্ত্রোক্তি সমূহে যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাদৃশ বিজ্ঞজনেরা এ গ্রন্থ পাঠ না করিলেই সুখী হইব।

এই গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধ 'প্রচার' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎকালে শারীরিক ও মানসিক বহুবিধ অসুস্থতা হেতু, আমি ইহা সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হই নাই। তজ্জন্য অনেকের নিকট আমি এতাবৎ কাল নিরতিশয় লজ্জিত ছিলাম। অধুনা ভগবৎ কৃপায় আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত হইল।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের সুবিমল শশধর,

স্বদেশ-বৎসলগণের গৌরবস্থল,

কবি-কুল-পুঙ্গব,

# শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের

সুপবিত্র ও সমাদৃত নামে,

তদীয় একান্ত গুণপক্ষপাতী

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক,

আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির

নিদর্শন স্বরূপে,

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।

মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা।

মধুমান্ নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

—ঋগ্বেদ সংহিতা।

(স্বাস্থ্যকর বায়ু প্রবাহিত হউক, নদীসমূহ হইতে অমৃত নিঃসৃত হউক, ওষধিসমূহ সুস্বাদ হউক, রাত্রি ও উষা স্বাস্থ্যপ্রদ হউক, পার্থিব রজঃপুঞ্জ স্বাস্থ্যজনক হউক, আমাদের পিতৃস্বরূপ দ্যুলোক সুখময় হউক, আমাদের বনস্পতিসমূহ ফলবান্ হউক, সূর্য্য আনন্দপ্রদ কিরণ বর্ষণ করুন, আমাদের গাভীসকল পয়স্বিনী হউক।)

# শান্তি।

প্রথম খণ্ড।

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিন যায়। একটি দুইটি করিয়া জীবনের কত দিনই চলিয়া গিয়াছে—আজিকার দিনও যায়। দিন যায়, আবার দিন আইসে; কিন্তু যে দিনটি যায় সেটি আর আইসে কি? সেটি আর আইসে না; এ কথা কে না বুঝে, কে না জানে? কিন্তু বল দেখি প্রতিদিন সূর্য্যদেবের অস্ত-গমন দেখিয়া সংসারের কয় জন ইহা মনে করে, দিন তো যায়—আজিকার দিনও চলিল; কিন্তু বল দেখি প্রতিদিন যাইবার সময়ে, আমাদিগকে কি বলিয়া যায়? সায়ংকালের বিহঙ্গম কূজন, অস্তোন্মুখ দিবাকরের আরক্ত লোচন, তামসী নিশার অগ্রদূতীগণের অপাঙ্গ দৃষ্টি, আমাদের বলিয়া দেয় না কি,—'হে মানব! এ ভব-রঙ্গ-ভূমিতে তুমি যে কয়দিনের জন্য লীলা খেলা করিতে আসিয়াছ, তাহার একটি দিন অদ্য কমিয়া গেল।' এ চৈতন্য—এ অবশ্যম্ভাবী সহজ জ্ঞান যদি মানবের থাকিত, প্রকৃতির এই দৈনন্দিন উপদেশ যদি মানব প্রণিধান করিত, তাহা হইলে মানুষ এত দিনে দেবত্ব লাভ করিত এবং সংসার শান্তি ও পুণ্যের নিকেতন হইত।

আমরা বলিতে বসিয়াছি, দিন যায়। পুণ্য-সলিলা

ভাগীরথীর বিশাল বক্ষঃ ভেদ করিয়া, দেশবিদেশের কতই নৌকা চলিতেছে। হেলিতে দুলিতে, ছোট বড় কতই তরণী গঙ্গাবক্ষে ভাসিতেছে। সন্ধ্যা হইলে নৌকায় নৌকায় প্রদীপ জ্বলিল। সেই আলোকের প্রতিবিম্ব জলে পড়িয়া জলমধ্যে প্রকাণ্ড আলোকরেখা বিরচিত হইল। নৌকা ছুটিতেছে—জলমধ্যে সঙ্গে সঙ্গে তাহার আলোকাভাও ছুটিতেছে। জল মধ্যে অগ্নি খেলিতেছে, কাঁপিতেছে, দুলিতেছে ও ছুটিতেছে। দুই বিধর্ম্মী জড়ের অদ্ভুত মিলন! ঝির ঝির করিয়া বারি-কণা-সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল বসন্ত বায়ু বহিতেছে। অদ্য পূর্ণিমা। আকাশে তারাদল-সংবেষ্টিত শশধর, পারিষদ ও অনুচর পরিবৃত নরপতির ন্যায়, সগৌরবে বিরাজিত। সন্নিহিত গ্রামের দেবালয় হইতে সান্ধ্য দেবারতির বাদ্য-ধ্বনি সমুত্থিত ও নিবৃত্ত হইল। এমন সময়ে, সুদূরস্থিত এক নৌকা হইতে, দুইজন মাঝি সমস্বরে-গীত ধরিল—

"ও যে চন্দন কাঠের না,
ডুবেও ডোবে না,
ও সে হাল ধরে রয়েছে রে তার পরমা গোয়ালা।"

কি মধুর, কি অপূর্ব্ব, কি হৃদয়দ্রবকর! সেই অপূর্ব্ব গীত-ধ্বনি, জাহ্নবীর পবিত্র বক্ষে নাচিতে নাচিতে, সেই সুস্নিগ্ধ মৃদু মন্দ বায়ু হিল্লোলের সহিত খেলিতে খেলিতে, সেই চন্দ্রমার সুনির্ম্মল কররাশির সহিত মিশিতে মিশিতে,

তথায় অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সংগঠিত করিল। সেই ক্ষেত্রে তখন সুন্দরে সুন্দরে সৌন্দর্য্য সমষ্টির সুন্দর সম্মিলন হইল। সুন্দর শশধর, সুন্দর নাবিক-সঙ্গীত, সুন্দর জাহ্নবীজল, সুন্দর বসন্তানীল। বিধাতা সকলকে এই সকল সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিবার সমান ক্ষমতা দেন নাই। যে ভাগ্যবান্ তাহা ভোগ করিতে সক্ষম, তিনি আপনার চিত্ত সেই মোহকর রাজ্যে ছাড়িয়া দিয়া, অবাক্ হইয়া রহিলেন।

পণ্য-ভার সমাকুলিত নৌকাসমূহ গুর্ব্বিনী নারীর ন্যায়, মন্থর গতিতে চলিতেছে। এ জগতে যাহার বোঝাটা হাল্কা, তাহার চাল-চলনও হাল্কা। হাল্কা নৌকাসব ফর ফর করিয়া চলিতেছে। কিন্তু সকল নৌকার কথায় আমাদের কাজ কি? সম্মুখে ঐ যে নৌকাখানি ধীরে ধীরে যাইতেছে, তাহাতে যে পুরুষ ও স্ত্রী বসিয়া আছেন, তাঁহাদের কথাই আমরা এক্ষণে বলিব। সেই নৌকার আরোহী রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার পত্নী সুকুমারী দেবী। রমাপতির বয়স ২৩।২৪ এবং সুকুমারীর বয়স অষ্টাদশ অতিক্রম করিয়াছে বোধ হয় না। কাটোয়া নামক গ্রামে রমাপতি মাসিক পঁচিশটি টাকা মাত্র বেতনে, স্কুল মাষ্টারি করেন। এরূপ অবস্থার লোকে পরিবার লইয়া কর্ম্মস্থানে থাকে না। কিন্তু কোন দিকে আর কেহ আপনার লোক না থাকায়, সুকুমারীকে ফেলিয়া, রমাপতি বিদেশে যাইতে অক্ষম। এই যুগলে বিধাতার অপূর্ব্ব সম্মিলন কৌশল

অপূর্ব্বরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। পুরুষ রমাপতি পৌরুষ শোভার আদর্শ এবং নারী সুকুমারী কামিনী-কুল-কমলিনী। ক্ষুদ্র নৌকা এই দুই সৌন্দর্য্যসার বক্ষে লইয়া, বুক ফুলাইয়া ভাসিতেছে। সুকুমারী নিরাভরণা, তাঁহার প্রকোষ্ঠে কালো হাড়ের চুরি ভিন্ন অন্য ভূষণ নাই। কিন্তু কি সুন্দর! সেই সুগোল হস্তে—সেই স্বর্ণবর্ণ সুকুমারীর সুকুমার প্রকোষ্ঠে, সেই কৃষ্ণভূষণ কি সুন্দরই দেখাইতেছে! আর রমাপতি? তাঁহার সেই বিশাল বক্ষে অতি শুভ্র যজ্ঞোপবীত হেলিয়া দুলিয়া কত শোভাই পাইতেছে। ভূষণ নামে বর্ত্তমানকালে যে সকল সামগ্রী ব্যবহৃত হয়, তাহাতে এমন অপার্থিব সৌন্দর্য্য বাড়ায় কি কমায় তাহা বিশেষ বিচার্য্য কথা। ভূষণ শোভা ও সৌন্দর্য্যের সহায়তা করে। যাহার যাহা নাই তাহারই তাহা পাইবার জন্য সহায়তার আবশ্যক হয়। যাহাদের রূপ নাই, অথবা রূপের অভাব আছে বলিয়া যাহারা জানে, অলঙ্কার তাহাদের সহায়। কিন্তু এস্থলে —যেথানে রূপ পূর্ণিমার চাঁদের মত পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত, সেথানে ছার ভূষণের প্রয়োজন?

রমাপতি দরিদ্র; তাঁহার সাত রাজার ধন সুকুমারীকে লইয়া তিনি আনন্দে আপনার জন্মভূমি—পিতৃপিতামহাদির নিবাসস্থান হুগলিতে ফিরিতেছেন। নৌকামধ্যে একটি কাঠের বাক্স, দুইটী কাপড়ের মোট, কয়েকখানি লেপ ও তোষক, দুইটী বালিস এবং কিছু

পিত্তল ও কাংস্যপাত্র রমাপতি ও সুকুমারীর বিষয়-বিভবের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

সুকুমারী জিজ্ঞাসিলেন,—

"উপর হইতে যে আরতির বাজনা শুনিতেছি, ও কোন্ গ্রাম?

রমাপতি উত্তর দিলেন,—

"শান্তিপুরের নাম কখন শুনিয়াছ কি? মেয়ে মানুষ শান্তিপুরের বড় ভক্ত; কারণ শান্তিপুর তাহাদের জন্য পুরুষ ভুলাইবার ফাঁদ তৈয়ার করিয়া দেয়। শান্তিপুরের উলঙ্গিনী সাড়ী নামেও যা, কাজেও তা। যাহারা কাপড় পরিয়াও উলঙ্গ থাকিতে চাহে, তাহারা, এখানকার তাঁতিদের আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, উলঙ্গিনী সাড়ী পরিয়া রূপের বাঁধন খুলিয়া দেয়। এই সেই শান্তিপুর। এখন তোমার জন্য সেই হাবুডুবু খাওয়ান, মন-মজান সাড়ী একখানি সংগ্রহ করিতে হইবে কি?"

সুকুমারী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা কর। যদি তোমার হাবুডুবু খাওয়ার এখনও বাকী থাকে, যদি তোমার মন এখনও পুরাপুরি না মজিয়া থাকে, তাহা হইলে কাজেই সে জন্য কল-কৌশল সন্ধান করিতে হইবে। কিন্তু কাপড়ে তাহার কি করিবে? কাপড়, অলঙ্কার প্রভৃতি সামগ্রী

বাহিরের শোভা বাড়ায়। কেবল বাহিরের শোভাতে কেবল বাহিরই মজে। সে মজা, সে হাবুডুবু কেবল নেশাখোরের নেশা। দুদিনেই তাহার শেষ হয়।”

রামপতি জিজ্ঞাসিলেন,—

“তবে তুমি চাও কি ?”

সুকুমারী সগর্ব্বে উত্তর দিলেন —

“আমি যাহা পাইয়াছি।”

রমাপতি প্রীতিপূর্ণ হাসির সহিত বলিলেন,—

“তুমি পাইয়াছ কি ? আমি তো দেখি তুমি কেবল সংসারের ক্লেশ ভুগিতে আসিয়াছ, মনের সাধে তাহাই ভোগ করিতেছ। আর আমার ভালবাসা ? সত্য কথা বলিব নাকি ? তুমি ছাড়া আর সকলকেই আমি খুব ভালবাসি।”

সুকুমারী বলিলেন,—

“আমার উপরে জন্ম-জন্মান্তরেও যেন তোমার এমনই নিগ্রহ থাকে। আমি জানি, তোমার যে ভালবাসার আমি অধিকারিণী, জগতে নারীজন্ম লাভ করিয়া, আর কখনই কেহ তেমন প্রেম ভোগ করিতে পায় নাই। কত শত রাজরাণীর দশা দেখিয়া আমি হাসিয়া মরি। তাহারা সংসারে আসিয়া কতকগুলা সোণার ঢেলা গায়ে জড়াইয়া হাসিয়া বেড়ায়। কিন্তু যে অমূল্য সোণার শিকলে ইহ-লোক ও পরোলোক বাধা আছে, তাহা তাহারা দেখিতেও

পায় না। আমার কষ্টের কথা বলিতেছ? হে মধুসূদন! তোমার পাদপদ্মে দাসীর এই প্রার্থনা, যে যতবার আমাকে এই মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হইবে, তত বারই যেন আমি এইরূপ কষ্টই পাই।”

সুকুমারীর চক্ষু জলভারাকুল হইল। রমাপতি মনে মনে বলিলেন,—“হে ভগবন্! আমি কি তপস্যার বলে, কোন্ সুকৃতির ফলে এই দেবীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছি? সার্থক আমার জন্ম। আমি তো ঐ দেবীর দাস।”

সুকুমারী আবার বলিলেন,—

“আর তোমার ভালবাসার কথা তুমি নিজে কি বুঝিবে? যে যাহা ভোগ করে, সেই তাহা বুঝে। তোমার ভালবাসা বুঝাইয়া বলিবার কথা নহে। আমার রক্ত মাংস, মন প্রাণ তোমার ভালবাসায় ডুবিয়া রহিয়াছে। হে নারায়ণ! কি পুণ্যে আমার এ সুখ? এ অধম নারীর প্রতি তোমার এ কি অতুল কৃপা?”

নৌকা চলিতে লাগিল। মাঝিরা চাকদহের নীচে রাত্রের মত নৌকা লাগাইয়া রাখিবে স্থির করিয়াছিল।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সহসা পশ্চিম গগনে একটু কালো মেঘ দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু ঝড়ও উঠিল। রমাপতি মাঝিদিগকে নৌকা না চালাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাহারা সামান্য ঝড় বুঝিয়া, নৌকা লাগাইয়া রাখি-বার কোনই দরকার মনে করিল না। চাকদহের এদিকে নৌকা লাগাইতে তাহাদের ইচ্ছাও ছিল না। সুতরাং তাহারা রমাপতির কথা না শুনিয়া, নৌকা চালাইতে লাগিল।

সুকুমারী বলিলেন,—

"ঝড়ও উঠিয়াছে, মেঘও হইয়াছে। চাকদহ পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে যদি ঝড় খুব বাড়িয়া উঠে, তাহা হইলে কি হইবে?"

রমাপতি বলিলেন,—

"তাহা হইলে নৌকা ডুবিয়া যহৈবে, সেটা বড়ই ভয়ের কথা নাকি?"

সুকুমারী বলিলেন,—

"ভয়ের কথা নহে সত্য। কারণ তোমার সাক্ষাতে তোমাকে ভাবিতে ভাবিতে মরিব, তাহার অপেক্ষা ভাগ্য

আর কি আছে? কিন্তু মরণের পর তোমার কাছে তো আর থাকিতে পাইব না।”

রমাপতি কহিলেন,—

“তোমার যদি মরণ হয়, তাহা হইলে আমারই কি জীবন থাকিবে পাগলিনি? আজিকার ঝড়ে যদি নৌকা ডুবিয়া যায়, তাহা হইলে তোমারও যে গতি, আমারও সেই গতি। আমরা জীবনে ও মরণে একই থাকিব। আজি যদি দেবতা আমাদের নৌকা ডুবাইয়া দিয়া সন্তুষ্ট হন, তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি করিবার অধিকার নাই। কিন্তু এটুকু তুমি স্থির জানিও, যে আমরা উভয়ে একসঙ্গে ডুবিব, একসঙ্গে যাতনা ভোগ করিব, একসঙ্গে এই ধূলার দেহ ছাড়িব, উভয়ে একসঙ্গে ইহার অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ দেহ ধরিব, তাহার পর উভয়ে একসঙ্গে এই যন্ত্রণাররাজ্য ছাড়িয়া, পরম আনন্দরাজ্যে বেড়াইব ও সকল আনন্দের যিনি মূল এবং সকল প্রেমের যিনি নিদান, উভয়ে একসঙ্গে সেই সর্ব্বফলদাতার গুণ-গান করিব। অতএব মরণে আমাদের দুঃখের কথা কি আছে?”

সুকুমারী কোন উত্তর দিলেন না; কিন্তু রমাপতির নিকটে আর একটু সরিয়া আসিলেন। ক্রমে ঝড় আরও উগ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিল; মেঘে সমস্ত গগন ছাইয়া গেল; সেই শোভাময় চন্দ্রতারা কোথায় লুকাইল এবং প্রকৃতি অতি বিকট বেশে সাজিয়া দাঁড়াইল। রণরঙ্গিণী প্রকৃতি

ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ ছড়াইয়া অট্টহাসি হাসিতে লাগিল। প্রবল বাত্যার শাঁ শাঁ শব্দে এবং মেঘের তীব্র গর্জ্জনে সেই রণোন্মাদিনী হুঙ্কারিতে লাগিল। মাঝিরা নৌকা স্থির রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু বিফল সে চেষ্টা। নদীবক্ষে বড় বড় ঢেউ উঠিল; সেই সকল তরঙ্গের জল নৌকার উপরেও উঠিতে লাগিল। মাঝিরা আগে কথা শুনে নাই, এখন নৌকা তীরে আনিবার জন্য কত চেষ্টাই করিতে লাগিল। কিন্তু নৌকাচালনা তাহাদের পক্ষে অনায়ত্ত হইয়া উঠিল রমাপতি সকলই জানিতেছেন ও বুঝিতেছেন। তিনি মাঝিদের জিজ্ঞাসিলেন,—

"গতিক কি?"

প্রধান মাঝি বলিল,—

"ঠাকুর, গতিক বড় মন্দ। এখন যা হয় কর।"

সুকুমারীর চক্ষু বহিয়া তখন ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। তিনি তখন দুই কর ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—

"হে অনাথনাথ! হে দীনবন্ধু! আমি মরি তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু দয়াময়! এই কর, যেন আমার ঐ দেবতা, ঐ গুরুর গুরুর কোন বিপদ না ঘটে। আমার মত একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকার মরা বাঁচায় সংসারের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না; কিন্তু ভক্তবৎসল দয়াময়! আমার

ঐ দেবতা, অসময়ে সংসার ত্যাগ করিলে, তোমার রাজ্যের অনেক ক্ষতি হইবে। হে মধুসূদন! প্রেমে যাঁহার হৃদয় পূর্ণ তিনি যদি সংসারে থাকিতে না পান, তবে আর থাকিবে কে? হে বিপন্নবান্ধব! এ অধমনারী তোমার চরণে আর কখন কোন ভিক্ষা চাহে নাই। তুমি কাতরের সহায়; আজি তুমি এ অধম নারীকে এ ভিক্ষা দিবে না দয়াময়? দিবে, দিবে, দিবে, অবশ্যই দিবে।”

তাহার পর রমাপতির দিকে ফিরিয়া, সুকুমারী তাঁহার চরণরেণু মস্তকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—

“আমার সর্ব্বস্ব! তুমি তো মরিতে পাইবে না। যিনি এই ভবনদীর প্রধান কর্ণধার, আমি সেই হরির চরণ ধরিয়া কাঁদিয়াছি। তিনি তোমাকে রাখিবেনই রাখিবেন। আমাকে তুমি যত ভালবাস তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। আমার কোন্ প্রার্থনা তুমি কবে না শুনিয়াছ? এই অন্তিমকালে, হে স্বামিদেব! তোমার চরণে আমার এক প্রার্থনা আছে। তুমি তাহা রক্ষা করিবে জানিলে, আমি হাসিতে হাসিতে মরি। আমি মরিয়া যাওয়ার পর তোমাকে আবার বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে হইবে।”

রমাপতি, তখন সুকুমারীকে সস্নেহে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিয়া, বলিলেন,—

“চল সুকুমারি! নৌকার ছাতের উপর গিয়া, যাহা বলিতে হয় বলিব, শুনিও।”

তাহার পর উভয়ে, আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া, বাহিরে আসিলেন। তখন রমাপতি বলিলেন,—

"শুন দেবি! তোমাকে চিরদিন দেবী জানিয়া কায়মনোবাক্যে তোমার উপাসনা করিয়াছি। আজি যদি তোমারই মরণ হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া বাঁচিতে পারিব কেন? এই তোমাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যদি এখনই নৌকা ডুবে, তাহা হইলে জানিও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দেহে নিঃশ্বাস বহিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে বাঁচাইতে যত্ন করিব। কিন্তু তাহাতেও যদি তোমাকে বাঁচাইয়া উঠিতে না পারি, তাহা হইলে জানিবে তোমারও যে গতি আমারও সেই গতি।"

সুকুমারী একটা উত্তর দিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তখনই একটা অতি ভয়ানক ব্যাতা আসিয়া নৌকা ডুবাইয়া দিল। সুকুমারীর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

নৌকা তো ডুবিয়া গেল, কিন্তু কোথায় রমাপতি—কোথায় সুকুমারী? ঐ যে—ঐ যে রমাপতি, সেই তরঙ্গায়িত জাহ্নবী বক্ষে, সুকুমারীকে পৃষ্ঠে লইয়া সাঁতার দিতেছেন। কখন জল তাঁহাদের উপর দিয়া চলিতেছে, কখন তাঁহারা জলের উপর দিয়া চলিতেছেন। নিবিড় অন্ধকারে চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে; কোথায়—কোন্ দিকে যাইতেছেন তাহা রমাপতি জানেন না। প্রবল ঝড়ে ও খর-স্রোতে কখন

বা তাঁহাদিগকে ডুবাইয়া দিতেছে কখন বা ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। অনবরত জলোচ্ছ্বাস তাঁহাদের মুখে আসিয়া লাগিতেছে ও উদরস্থ হইতেছে। তথাপি রমাপতি, পূর্ণ উদ্যমে, সকল বিঘ্নের সহিত, ঘোর যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে যে ভার রহিয়াছে, তাহার কল্যাণ-কামনায়, তিনি কোন বিপদকেই বিপদ বলিয়া মনে করিতেছেন না। কিন্তু সকল বিষয়েরই সীমা আছে। মানবদেহের ক্ষমতাদিরও একটা সীমা আছে সন্দেহ নাই। বহুক্ষণ এইরূপ বিজাতীয় শ্রমে রমাপতি নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। সুকুমারী তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—

"আমাকে ছাড়িয়া দাও, হয় ত আমিও সাঁতার দিতে পারিব।"

হাঁফাইতে হাঁফাইতে কাতর স্বরে রমাপতি বলিলেন,—

"কাহাকে ছাড়িয়া দিব ?—তোমার ঐ শরীর ?—মরণের পর।"

কিন্তু ক্রমশঃই রমাপতি অধিকতর ক্লান্ত ও অক্ষম হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তখন সুকুমারী অন্য উপায়াভাবে কৌশল করিয়া রমাপতির পৃষ্ঠাশ্রয় ত্যাগ করিলেন এবং তখনই ডুবিয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ রুদ্ধশ্বাস রমাপতি "সুকুমারী, সুকুমারী!" শব্দে

চীৎকার করিয়া সেই স্থলে ডুবিয়া গেলেন। অচির-কাল মধ্যে সুকুমারীকে লইয়া রমাপতি পুনরায় ভাসিয়া উঠিলেন এবং পাছে সুকুমারী আবার ফাঁকি দেন, এই আশঙ্কায়, তাঁহার প্রকোষ্ঠ আপনার দন্ত মধ্যে কঠিনরূপে ধারণ করিলেন। কোমলাঙ্গীর হস্ত দন্তঘাতে কাটিয়া গেল এবং সেই ক্ষতমুখ হইতে অবিরল ধারায় রুধির প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীর নীরে মিশিতে লাগিল। সুকুমারী, রমাপতির পৃষ্ঠ ত্যাগ করিবার জন্য, কোন প্রকার বল প্রয়োগ করিলেন না। তিনি বুঝিতেন, এ সময়ে জোর করিলে, রমাপতির জীবনের এখনও যদি কোন আশা থাকে, তাহাও আর থাকিবে না। রমাপতি ক্রমে নিতান্ত অবসন্ন হইয়াপড়ি-লেন এবং সময়ে সময়ে সুকুমারীর সহিত ডুবিয়া পড়িতে লাগিলেন। শরীর আর বহে না, হাত আর উঠে না, পা আর নড়ে না, নিশ্বাস আর চলে না। তিনি বুঝিলেন, আর রক্ষা নাই! তখন তিনি বলিলেন,—

"সুকুমারি! আর বাঁচাইতে পারিব না। তোমা-রও যে গতি, আমারও—"তিনি যেই কথা কহিতে গেলেন, সেই তাঁহার দন্তমধ্য হইতে সুকুমারীর হস্ত খুলিয়া গেল। তখনই সুকুমারী আবার জলে ডুবিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি এক সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়া জলে ডুব দিলেন।

এদিকে ঝড় একটু থামিল; ক্রমে ক্রমে মেঘ উড়িয়া যাওয়ায়, আকাশ-মণ্ডল আবার পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। ক্রমে চন্দ্র ও তারা, উকি দিতে দিতে, বাহির হইয়া পড়িলেন এবং জাহ্নবী-বক্ষ আবার চন্দ্রকরোজ্জ্বল হইয়া হাসিতে লাগিল। পরিবর্ত্তশীলা প্রকৃতি দেবী আবার শোভাময়ী সুন্দরীর বেশ ধারণ করিলেন। আকাশ বেশ খোলসা হইয়াছে এবং আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই দেখিয়া, দুই এক খানি নৌকাও লগী উঠাইয়া, কাছি খুলিয়া, গা ভাসাইয়া দিল।

রমাপতি ভাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু কোথায় সুকুমারী? রমাপতি সাধ্যমত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—

"সুকুমারী, সুকুমারী!"

কিন্তু কোথায় সুকুমারী?

আবার রমাপতি ডুবিলেন এবং আবার উঠিয়া ডাকিলেন,—

"সুকুমারী, সুকুমারী!"

কিন্তু কোথায় সুকুমারী?

তখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, মর্ম্মাহত, রুদ্ধশ্বাস রমাপতির চৈতন্য তিরোহিত হইল এবং তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস শ্বাসনালী ত্যাগ করিল।

কিছু দূরে একখানি নৌকা আসিতেছিল। তদুপরিস্থিত লোকেরা রমাপতির শব্দ শুনিয়া স্থির করিল,

এই ঝড়ে যাহাদের নৌকা ডুবিয়াছে, তাহার মধ্যে তিনিও একজন। তাহারা দ্রুত আসিয়া তাঁহাকে আপনাদের নৌকায় তুলিল এবং বহু কৌশলে ও শুশ্রূষায় তাঁহাকে আবার চেতন করিল। চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি চীকার করিয়া উঠিলেন,—

"সুকুমারী, সুকুমারী!"

কিন্তু কোথায় সুকুমারী?

তখন রমাপতি একে একে নৌকার তাবৎ লোকের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, তাহাদের মধ্যে সুকুমারী নাই। তখন কেহ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই, তিনি গঙ্গা-প্রবাহে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুইজন নাবিকও জলে পড়িল এবং শীঘ্রই তাঁহাকে উঠাইয়া আনিল। এবার নৌকার লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া রহিল। তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন।

"সুকুমারী, সুকুমারী!"

কিন্তু কোথায় সুকুমারী?

সুকুমারীকে হারাইয়াও, রমাপতির মরা হইল না। তাঁহার যে অবস্থা তাহাতে বাঁচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনা এবং মৃত্যু তাহার তুলনায় পরম সুখ। অনেক শত্রু মিলিয়া তাঁহাকে সে সুখ ভোগ করিতে দিল না। যেখানে মৃত্যুর নামে হৃৎকম্প উপস্থিত

হয়, মৃত্যু সে স্থলে অগ্রেই উপস্থিত। যেখানে, মৃত্যু দেখা দিলে, আত্মীয়বর্গ শোকে আকুল হইবে, রোদনে ও আর্ত্তনাদে বসুধা প্লাবিত হইবে, জীবিত স্বজনগণ যাতনায় অবসন্ন হইবে, সেখানে মৃত্যু, তস্করের ন্যায়, অলক্ষিত ভাবে, সমাগত হইয়া সর্ব্বনাশসাধনে তৎপর। আর যেখানে মানব মৃত্যুকে শান্তিনিকেতন বলিয়া জ্ঞান করে, মৃত্যুর নিমিত্ত লালায়িত হয়, সেখানে শত সাধনাতেও মৃত্যুর দেখা নাই। মৃত্যুর নিমিত্ত লালায়িত রমাপতি মরিতে পাইলেন না। সুকুমারীকে হারাইয়াও, তাঁহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইল। অনেক শত্রু আত্মীয়তা করিয়া, যাতনা-ক্লিষ্ট রমাপতিকে মরিতে দিল না।

যে নৌকা আসিয়া রমাপতিকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিল, তাহাতে রাধানাথ চট্টোপাধ্যায় নামে এক প্রভূতধনসম্পন্ন অতি অমায়িক স্বভাব ব্যক্তি, আপনার দলবল সহ, আরোহী ছিলেন। সেই রাধানাথ বাবু ও তাঁহার অনুগত জনেরা রমাপতিকে দুঃসহ যাতনার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে দিলেন না। তাঁহারা অতি যত্নে রমাপতিকে সঙ্গে লইয়া হালিসহরে আসিলেন। সেখানে রাধানাথের অতি প্রকাণ্ড বাসভবনে রমাপতি অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ ও বিনোদিত করিবার

নিমিত্ত, রাধানাথ নানা সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার স্বভাবের কোমলতা, অবস্থার নিতান্ত হীনতা, বিপদের যৎপরোনাস্তি প্রগাঢ়তা, সংসারে স্বজন-বিহীনতা প্রভৃতি তাঁহার প্রতি রাধানাথের অমিত স্নেহ আকর্ষণ করিল। রাধানাথ তাঁহাকে পুত্রবাৎসল্যে পালন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অপরিসীম শোক কথঞ্চিৎ মন্দীভূত ও প্রশমিত হইলে তাঁহাকে পুনরায় বিবাহিত করিয়া সংসারি করিয়া দিবেন সঙ্কল্প করিলেন। নিয়ত তাঁহার সঙ্গে সমবয়স্ক সদালাপী লোক এবং শরীর রক্ষার্থ দ্বারবান ফিরিতে লাগিল; রাধানাথ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী, রমাপতি না খাইলে আপনারা অন্নজল ত্যাগ করিবেন ভয় দেখাইয়া, তাঁহাকে যথাসময়ে আহার করাইতে লাগিলেন; অধ্যয়নে তাঁহার অনুরাগ ছিল জানিয়া, রাশি রাশি নূতন পুস্তক তাঁহার জন্য সমানীত হইতে লাগিল; সঙ্গীতে মানবমন মুগ্ধ হয় বিশ্বাসে, তাহারও বিশেষ ব্যবস্থা করা হইল; সংক্ষেপতঃ একদিনে, একবারে মরিতে না দিয়া, তাঁহার নিত্যমৃত্যুর বিশেষ আয়োজন করা হইল। সুকুমারী হারা হইয়াও, রমাপতি বাঁচিয়া রহিলেন।

কিন্তু তোমরা যাহাই বল, সকল কাণ্ডেই বিধাতার অতি আশ্চর্য্য বিধি আছে। শোক, যতই কেন

কঠোর হউক না, তাহার নিবারণ সম্বন্ধে সময় অমোঘ মহৌষধ। তীব্র শোক—অপরিসীম প্রেমাস্পদের বিয়োগজনিত দুঃসহ জ্বালা হৃদয়ে যে অনপনেয় অঙ্কপাত করে, তাহার বিলোপ করিতে কালের সাধ্য নাই। কিন্তু শোকের পরুষতা, দিনে না হউক মাসে, মাসে না হউক বৎসরে, অবশ্যই মন্দীভূত হইয়া আইসে। উপদেশ বা শিক্ষা সর্ব্বত্র শোকের প্রখরতা নষ্ট করিতে সক্ষম নহে। তাহা হইলে,

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥"

স্বয়ং ভগবানের এই মহদুপদেশ বিদ্যমান থাকিতে, লোকে শোকে বিহ্বল হয় কেন?

দেখিতে দেখিতে বৎসর অতীত হইল। রমাপতি, সুকুমারী হারা হইয়াও, এই সুদীর্ঘ কাল অবিচ্ছেদে মৃত্যু-যাতনা সহিতে সহিতে জীবন বহিয়া আসিতেছেন।

তাঁহার ব্যবহার, তাঁহার সততা, তাঁহার বিদ্যা, তাঁহার শোক, তাঁহার রূপ, সকলই তাঁহাকে, তাঁহার আশ্রয়দাতার পরিবার মধ্যে, আত্মীয় হইতেও আত্মীয় করিয়া তুলিল। ক্রমে ক্রমে রমাপতি যেন সেই পরিবারের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। তাঁহার

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। সাংখ্যযোগ। ২৭ শ্লোক।

স্নেহ বন্ধনে, সামান্য ভৃত্য হইতে গৃহস্বামী পর্য্যন্ত এবং সামান্যা দাসী হইতে গৃহিণী ঠাকুরাণী পর্য্যন্ত, সকলেই বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেই বিশালপুরীর সর্ব্ব-ভাগই তাঁহার নিমিত্ত উন্মুক্ত; সেই বিপুল বিভব তাঁহার সুখসংবিধানে নিয়োজিত; সেই অগণ্য দাসদাসী তাঁহার প্রীতি সমুৎপাদনে সচেষ্ট এবং সেই গৃহস্বামী তাহার সন্তোষ সংসাধনে ব্যতিব্যস্ত। দীনহীন রমাপতির একি অত্যদ্ভুত দশা-বিপর্য্যয়! বিশ্ববিধাতা মঙ্গলময় নারায়ণের বাসনায় কি না হইয়া থাকে; পরমপুরুষের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। হে অনাথনাথ, ইচ্ছাময়, হরি! তোমার একি কৌশলময় ব্যবস্থা? তুমি একদিকে মারিতেছ, আর একদিকে রাখিতেছ এবং এক দিকে ভাঙ্গিতেছ, আর একদিকে গড়িতেছ। হে নারায়ণ! তুমি রাখিলে তাহাকে মারে কে? তুমি মারিলে তাহাকে রাখে কে? হে সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম! এ সংসারে কেবল তুমিই সার ও সত্য। কবে সে দিন হইবে, যখন আমরা অমেয় শোকে বা বিপদে, অসীম সুখে বা আনন্দে তোমার নাম স্মরণ করিতে ভুলিব না? বিশ্বেশ্বরের বাসনায় সুকুমারীকে হারাইয়াও রমাপতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইল।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"পোড়ারমুখো পাখি! পড়িতে পারেন না, কিছু না, কেবল ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁ। ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিস্ তো ভাল, নহিলে তোকে আজি আর ছোলা দিব না।"

একটী ইন্দীবরাননা, দ্বাদশবর্ষীয়া, পরমা-সুন্দরী বালিকা, আপনার সুবৃহৎ সমুজ্জ্বল কাকাতুয়া পক্ষীর দাঁড় হাতে লইয়া, পাখীকে এইরূপে তিরস্কার করিতেছিলেন। পাখী এ তিরস্কারের মর্ম্ম বুঝিল কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু সে আবার চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁ।"

"মা গো, কাণ ঝালা পালা করিয়া দিল। থাক্ তুই। আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া সে সুন্দরী, কাকাতুয়ার দাঁড় তাহার শকে ঝুলাইয়া দিয়া, সে দিক হইতে যেমন ফিরিলেন অমনই এক দেব-কান্তি যুবক-মূর্ত্তি তাঁহার নয়নে পড়িল। যুবককে দর্শনমাত্র বালিকা আনন্দে উৎফুল্লা হইয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিলেন। সুন্দরী বালিকাকে, যুবক জিজ্ঞাসিলেন,—

"সুরবালা! আজি আর তবে আমার সঙ্গে ঝগড়া হবে না বোধ হয়। আজিকার ঝগড়া কেবল পাখীর সঙ্গে—কেমন?"

সুরবালা উত্তর দিলেন,—

"তা বই কি? রমাপতি বাবু! আজি আপনার সঙ্গে ভারী ঝগড়া করিব ঠিক করিয়া আছি।"

এই বলিয়া বালিকা, অতি আদরের সহিত রমাপতি বাবুর হাত ধরিয়া, তত্রত্য এক খানি সুন্দর কৌচে বসাইলেন এবং আপনিও তাহারই একদিকে বসিলেন।

এই স্থানে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই সুন্দরী বালিকা রাধানাথ বাবুর একমাত্র সন্তান; তাঁহার বিপুল বিভব, এবং নানা সুখৈশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারিণী। সুরবালা অবিবাহিতা। রাধানাথ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী যেরূপ পাত্র পাইলে কন্যার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়া আছেন, তাহা সহজে মিলে না। পাত্র অতি রূপবান, সুশীল, শান্ত ও বিদ্বান হওয়া চাই; নিস্ব, নিরাশ্রয়, ও নিরবলম্বন হওয়া চাই; তাহার আর কেহ আপনার লোক না থাকে এবং সুরবালাকে কখন পিতৃগৃহ হইতে আর কোথাও লইয়া যাইতে না চাহে, এমন পাত্র চাই। এরূপ অষ্টবজ্র সম্মিলন সহজ নহে। সুতরাং বিবাহযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হইতেছে, তথাপি সুরবালার বিবাহ হইতেছে না।

আসনে উপবেশন করিয়া রমাপতি বাবু বলিলেন,—

"আজি আমার এমন কি দোষ হইয়াছে যে ভারী ঝগড়া না করিলে চলিবে না ?"

সুরবালা বলিলেন,—

"দোষ আজি একটা নাকি ? সারাদিন পরে বিকালে একবার দেখা দিয়া, জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন কি দোষ হইয়াছে ? আজি এত দোষ হইয়াছে যে, উপরি উপরি তিন দিন ঝগড়া না করিলে চলিবে না।"

রমাপতি বলিলেন,—

"আরম্ভ কর তবে—দেরি কেন ? যখন [illegible]ড়া না করিলে চলিবে না ঠিক করিয়াছ, তখন আর দেরী করিয়া কাজ কি ? আমি প্রস্তুত।"

বালিকা বলিলেন,—

"অমন করিয়া ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না—হাঁ।"

রামপতি বলিলেন,—

"তা কি চলে ? তুমি আরম্ভ কর, আমি বাধন দিতেছি।"

বালিকা ঝগড়া করিতে পারিল না। এমন করিয়া কখন কি ঝগড়া করা যায় গা ? ঝগড়া শাস্ত্রে সুরবালা সুপণ্ডিতা হইলে, যাহার সহিত ঝগড়া করিতে

হইবে, তাহার সহিত এমন করিয়া পরামর্শ করিতে আসিতেন না। তখন সুরবালা, অতি চেষ্টায় মুখের সমস্ত হাসি লুকাইয়া, যতদূর সাধ্য গম্ভীর হইয়া, এবং কণ্ঠস্বর বিশেষ ভারি করিয়া, বলিলেন,—

"আচ্ছা—আচ্ছা—আজি হইতে আপনার সঙ্গে আমার আড়ি।"

বালিকা আড়ির প্রগাঢ়তা বুঝাইবার জন্য, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ আপানার চিবুকে স্পর্শ করাইয়া মুখ ফিরাইলেন। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে আড়ি সাব্যস্ত হইয়া গেল।

পাকাপাকি রকম আড়ি হইল দেখিয়া রামপতি বলিলেন,—

"আমি বাঁচিলাম। অনেক দিন না কাঁদিয়া আমার প্রাণ বড় অস্থির হইয়াছে। এখন তুমি যদি দুই তিন দিন কিছু না বল, তাহা হইলে আমি একটু কঁদিয়া বাঁচি।"

সুরবালা ফিরিয়া বসিলেন। ধীরে ধীরে তাহার বদন হইতে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য তিরোহিত হইল। তখন প্রকৃত গাম্ভীর্য্যের রেখাসমূহ সেই বালিকার বদন-মণ্ডলে প্রকটিত হইল। ক্রমে তাঁহার চক্ষু ঈষৎ জলভারাকুল হইল। তখন তিনি বলিলেন—

"রামপতি বাবু! চিরকালই কি কাঁদিতে হইবে?

এ কাঁদার কি শেষ নাই? আপনার যতই কষ্ট হউক, আপনাকে আমি আর কখনও কাঁদিতে দিব না। আপনি যদি আর কাঁদেন দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমি এবার জলে ডুবিয়া মরিব।"

রামপতি সস্নেহে বলিলেন,—

"ছি সুরো! ও কথা কি বলিতে আছে? তোমার কথায় আমি তো কান্না ছাড়িয়া দিয়াছি। আর আমি কখনই কাঁদিব না সুরো।"

সুরবালা বলিলেন,—

কাঁদিবেন না যেন; কিন্তু আমি দেখিতে পাই সারাদিনই আপনি বড়ই কাতর থাকেন। আপনি খান, কেবল আমাদের দায়ে; শয়ন করেন, কেবল আমাদের জ্বালায়; কথাবার্ত্তা কন, কেবল আমাদের দৌরাত্ম্যে, আমাকে পড়া বলিয়া দেন, ছাড়ি না বলিয়া। আমি সারাদিন দেখি আর ভাবি, দুঃখে আপনার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। আপনার সেই অবস্থা দেখিয়া আমি কতদিন লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদি।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বালিকার উজ্জ্বল আয়ত লোচনদ্বয় হইতে স্থূল অশ্রুবিন্দু সমূহ ঝরিতে লাগিল। সুরবালা অঞ্চলের কাপড় দিয়া বদন আবৃত করিলেন। ধন্য সে মানব, যে শোকে এরূপ সহানুভূতি পায়!

তখন অতি কোমলতার সহিত রামপতি সুরবালার মুখের কাপড় খুলিয়া, তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিলেন এবং অতি প্রীতিময় স্বরে বলিলেন,—

"না সুরো না—আমি আগে যেমন ছিলাম এখন তো আর তেমন নাই। তোমার স্নেহ তোমার দয়া এখন আমাকে সকল দুঃখ ভুলাইয়া দিতেছে। আমার এখন কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা কি তুমি দেখিতে পাও না? তোমার হাসি কান্না এখন আমাকে হাসাইতে কাঁদাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তোমার ভালবাসা ক্রমে আমাকে সকলই ভুলাইয়া দিতেছে।"

সুরবালার মুখে হাসি আসিল। তিনি অন্য কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সেই সুবিস্তৃত প্রকোষ্ঠ মধ্যে আর দুই ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। সেই দুই জনের মধ্যে যিনি পুরুষ তিনিই রাধানাথ। উজ্জ্বল ও উন্নত ললাট, পরিপুষ্ট দেহ, আয়ত লোচন, গৌর-বর্ণ, তাঁহার সুপরিণত কলেবরের শ্রী প্রকাশ করি-তেছে। তাঁহার বয়স চল্লিশ; কিন্তু মাথায় রজত-সূত্রবৎ পক্ক কেশের ঘটাটা খুব বেশী। সঙ্গে তাঁহার অন্ধের যষ্টি, অন্ধকারের আলো, ভবনদীর ভেলা, বুড়া বয়সের সম্বল, ভুবনেশ্বরী—রাধানাথের ব্রাহ্মণী। এই প্রৌঢ় প্রৌঢ়া দম্পতির সমাগমে

ঘরের শ্রী ফিরিয়া গেল। যাঁহারা নবীন নবীনার শোভায় বিমোহিত, তাঁহারা হয় ত এ মন্দভাগ্য গ্রন্থকারকে নিতান্ত বৃদ্ধ বলিয়াই মনে করিবেন এবং যৎপরোনাস্তি অরসিক বলিয়া গালি দিবেন। কিন্তু যাহা হউক আমি আবার বলিতেছি, সেই প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার পূর্ণাঙ্গ সমূহের যে সুপরিণত শোভা তাহার তুলনাস্থল অতি বিরল।

রাধানানাথ আসিয়াই জিজ্ঞাসিলেন—

"একি সুরো, তুমি কাঁদিতেছিলে নাকি ?"

সুরবালা দৌড়িয়া পিতার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

"দেখ দেখি বাবা, রামপতি বাবু আজিও কাঁদিতে চাহিতেছেন। মা! তুমি ত আর কিছু বল না। কেবল তোমার কথাই উনি শুনেন।"

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—

"তুই যেমন পাগ্‌লী, তোকে তেমনি ক্ষেপায়। রমাপতি কাঁদিবে কি দুঃখে? কেন বাবা! তুমি আবার কাঁদার কথা বল ?"

রমাপতি বলিলেন,—

"না মা! আপনি সুরোর কথা শুনিবেন না।"

ভুবনেশ্বরী আবার বলিলেন,—

"আজি সারাদিনটা তোমাকে একবারও দেখিতে

পাই নাই। কালি বৈকালে বড় মাথা ধরিয়াছিল বলিয়াছিলে; আজি কেমন আছ? তুমি এদিকে আসিয়াছ শুনিয়া তোমাকে দেখিতে আসিলাম।”

রাধানাথ বলিলেন,—

“আর আমি আসিলাম, সুরোকে এক খবর দিতে। সুরো যদি সন্দেশ খাওয়ায় তবে বলি।”

সুরো ব্যস্ত হইয়া বলিল,—

“কি বাবা, কি বাবা?”

রাধানাথ বলিলেন,—

“রমাপতি! সম্প্রতি তোমার, আমার, সুরোর এবং গৃহিণীর যে ছবি প্রস্তুত করিতে দিয়াছিলাম, তাহা আজি আসিয়া পৌছিয়াছে! তোমরা দেখিবে চল।”

সুরবালা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসিলেন,—

“কোথায় আছে বাবা?”

পিতা উত্তর দিলেন,—

“তোমার জন্যই আসিয়াছে, তোমারই ঘরে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।”

সুরবালা মহাহ্লাদে রমাপতির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।

ভুবনেশ্বরী দেবী একটু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"রমাপতি যদি আমাদের ছেলে হইত ?"

রাধানাথ বলিলেন,—

"কেন রমাপতি কি এখনও আমাদের ছেলে হইতে পারে না ?"

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আরও এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কার্ত্তিক মাস, বেলা সার্দ্ধদ্বিপ্রহর। হালিসহরে রাধানাথ বাবুর রাজ-প্রাসাদসদৃশ সুবিস্তৃত ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে রমাপতি একাকী উপবিষ্ট। প্রকোষ্ঠ সুসজ্জিত। তলে সুন্দর গালিচা বিস্তৃত, তদুপরি সাটিনাবৃত নানাবিধ কোচ ও চেয়ার এবং মর্ম্মর প্রস্তর ও কাষ্ঠনির্ম্মিত টেবিল আলমায়রা ইত্যাদি। আলমায়রা সকল স্বর্ণবর্ণাবরণাবৃত গ্রন্থ-ভারে প্রপীড়িত; যেন রত্নব্যবসায়ীর বিপণি! ভিত্তি গাত্রে মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহের সুরঞ্জিত চিত্রাবলী। ভবনের যে ভাগে এই বহ্বায়ত প্রকোষ্ঠ সংস্থিত, ইচ্ছা করিলে বা আবশ্যক হইলে, পুরমহিলারাও অপর লোকের অলক্ষিত ভাবে তাহাতে যাতায়াত করিতে পারেন। এই প্রকোষ্ঠ রমাপতি বাবুর পঠনালয়!

প্রকোষ্ঠ মধ্যস্থ একতম কোচে রমাপতি বাবু অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় উপবিষ্ট। তাঁহার হস্তে একখানি স্বর্ণসীমাবদ্ধ ফটোগ্রাফ। সেই চিত্র এক নারীমূর্ত্তির প্রতিকৃতি। রমাপতি এক একবার সেই আলেখ্য

দর্শন করিতেছেন, আবার তাহা নয়ন হইতে অন্তরিত করিতেছেন। কাহার এ চিত্র? কোন্ নারীর প্রতিকৃতি আজি রমাপতির নয়ন-মন আকর্ষণ করিয়া বিরাজ করিতেছে? অবশ্যই সুকুমারীর। যে সুকুমারীর জন্য রমাপতি আত্মজীবন অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান করেন; যে সুকুমারীর কল্যাণার্থ রমাপতি ঘোর বিপদকেও বিপদ বলিয়া মনে করেন না; যে সুকুমারীর অভাবে রমাপতি মৃতকল্প হইয়া দুঃসহ যমযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন এবং যে সুকুমারীকে রমাপতি দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন; রমাপতির হস্তে অধুনা যে নারীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, তাহা সেই সুকুমারীর প্রতিকৃতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু হায়! কি বলিয়া বলিব? কেমন করিয়া মানব মনের এতাদৃশ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনের কথা বুঝাইব? মানব হৃদয়ের এরূপ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনের কথা কেই বা সহজে বিশ্বাস করিবে? রমাপতির হস্তে সুকুমারীর ফটোগ্রাফ নহে। সুকুমারী, সর্ব্ব সমক্ষে, বিপুল নীররাশির মধ্যে সমাহিত হইয়াছেন। তিনি যে সময়ে রমাপতির হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন, রমাপতির তদানীন্তন অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এরূপ ব্যয়-সাধ্য বিলাস তাহার সাধ্যায়ত্ত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে এ চিত্র কাহার? তাহাও কি ছাই

আমার না বলিলে চলিবে না? এ চিত্র—এ চিত্র সুন্দরী শিরোমণি, রাধানাথ-তনয়া সুরবালার প্রতিকৃতি।

সুকুমারি! আজি তুমি কোথায়? আইস, যদি সম্ভব হয়, তোমার সেই সলিল-সমাধি হইতে সমুত্থিত হইয়া, আজি একবার আইস। দেখ তোমার যিনি [illegible] গুরু, তোমার যিনি দেবতা, তিনি আজি তোমার কে? আর দেখ, যিনি তোমার মর্ম্মভেদী অনুরোধেও তোমাছাড়া হইয়া জীবনের অন্য গতি পরিগ্রহ করিতে সম্মত হন নাই, সেই তিনি আজি বিরলে বসিয়া, আর এক সুন্দরীর প্রতিকৃতি পর্য্যালোচনা করিতেছেন। ধন্য কাল! ধন্য তোমার সর্ব্বস্মৃতি-বিলোপকারী মহৌষধ!

রমাপতি চিত্র দেখিতেছেন ও আবার তাহা নয়ন-সম্মুখ হইতে অপসারিত করিতেছেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও কাতর। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। চিত্র সেই কৌচেই পড়িয়া রহিল। নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে, সেই গৃহ-মধ্যে দুই তিনবার পরিভ্রমণ করিয়া তিনি আবার সেই কৌচের সমীপস্থ হইলেন এবং সেই চিত্র আবার হস্তে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার মনে, না জানি, তখন কি প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল। মনের ভাব মনে মনে পোষণ করা যেন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তিনি তখন অতি অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

সুরবালা! এ দুরাশা আমার হৃদয়ে কেন স্থান পাইল? আমি অভাগা, আমি দীন-হীন। আমার হৃদয় কখনই তোমার উপযুক্ত আসন নহে। তাহা জানিয়াও কেন আমি এ দুরাশায় ঝাঁপ দিয়াছি? কেন আমি অন্তরে ও বাহিরে কেবল তোমাকেই দেখিতেছি?”

সেই চিত্র হস্তে করিয়াই, রমাপতি একবার সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া আসিলেন। আবার সেই কৌচের সমীপস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

“কিন্তু না। তোমাকে পাওয়া যদি আমার পক্ষে কখন সম্ভব হয়, তাহা হইলেও আমি তোমাকে কখনই গ্রহণ করিব না। আমার হৃদয় বহ্নিচর্ব্বিত, আমার হৃদয় মরুভূমি। তুমি যে আদরের—যে সোহাগের সামগ্রী, তাহা আমি কোথায় পাইব? তোমাকে তাহা কেমন করিয়া দিব? তুমি দেবী। স্বর্গীয় সুখে তোমার অধিকার। এ অভাগা সে সুখের কণিকাও তোমাকে দিতে পারিবে না। তবে কেন, সুরবালা আমি তোমাকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইব? না দেবী! তোমার, আমার হইয়া কাজ নাই।”

রমাপতি চিত্র ত্যাগ করিয়া আর একবার গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিলেন এবং আবার সেই কৌচের সমীপস্থ হইয়া চিত্র গ্রহণ করিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন,—

"কিন্তু সুরবালা! আমি চিরদিনই এমন ছিলাম না। একদিন জগতে আমার মত ভাগ্যবান আর কেহই ছিল কি না সন্দেহ। আমার এই হৃদয় তখন নন্দন-কাননের ন্যায় আনন্দ-ধাম ছিল। সুখ ও শান্তি তখন এ হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়া থাকিত, সন্তোষ ও সৌভাগ্য তখন এ হৃদয় ছাড়িত না। তখন এ হৃদয়ে এক দেবীর রাজ-সিংহাসন ছিল; কিন্তু সে দেবী আজি কোথায়? সুকুমারি! সুকুমারি! তুমি আজি কোথায়? তোমার জন্য, তোমার অভাবে, আজি আমার জীবন শুষ্ক, আজি আমি অভাগা। আইস আমার দেবী, আইস করুণা-ময়ী, আমাকে দেখা দিয়া বাঁচাও—আমাকে আবার ভাগ্যবান কর। দুই বৎসর—দুই সুদীর্ঘ বৎসর আমি তোমাছাড়া হইয়া রহিয়াছি। যদি নিতান্তই দেখা না দেও, যদি তুমি এমনই নিষ্ঠুর হইয়া থাক, যদি নিতান্তই আর না আইস, তবে আমাকেও তোমার সঙ্গী করিয়া লও।"

রমাপতি সেই কৌচের উপর বসিয়া পড়িলেন এবং বসনে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বস্থ একটী দ্বার খুলিয়া গেল। তখন সেই উন্মুক্ত দ্বার দিয়া নানা রত্না-লঙ্কার বিভূষিতা, সমুজ্জ্বল স্বর্ণ-সূত্র-বিনির্ম্মিত-বসনাবৃতা, পরম শোভাময়ী সুরবালা সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করি-

লেন। তাঁহার অলঙ্কারশিঞ্জিত শ্রবণ করিয়া, রমাপতি ব্যস্ততাসহ সেই প্রতিকৃতি প্রচ্ছন্ন করিলেন। সুরবালা তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি রমাপতির সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—

“একি? একি রমাপতি বাবু! তুমি কাঁদিতেছ নাকি?”

তখন রমাপতি মুখের বসন অপসারিত করিয়া বলিলেন,—

“যাও দেবি, যাও সুরবালা, আমার নিকট তুমি আর আসিও না। আমি অধম, আমি অভাগা, আমি দীনহীন। আমার হৃদয় শুষ্ক, নীরস, মরুভূমি। তুমি দেবী, আমার নিকটে তোমার স্থান হইবে না।”

সুরবালা, রমাপতির কথা ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া, অনেকক্ষণ অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিয়া উঠিলেন,—

“তোমার নিকট যদি আমার স্থান না হয়, রমাপতি! তবে ইহ জগতে আমার আর স্থান নাই। তুমিই আমার দেবতা, তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার সন্তোষ; যদি তোমার হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি হয়, তাহা হইলে তাহাই আমার স্বর্গ। তোমাকে ছাড়িয়া আমি অন্য স্বর্গে যাইব না।”

এই বলিয়া বালিকা লজ্জায় অধোবদন হইল। তখন রমাপতি বলিলেন,—"কিন্তু দেবি! তোমাকে আমি কি দিব? তোমার এ অনুগ্রহের প্রতিশোধ আমি কি দিতে পারি? আমার কি আছে?"

সুরবালা, তাঁহাকে আর কথা বলিতে না দিয়া, স্বয়ং বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি আমাকে আর কি দিবে তাহা জানি না। তোমার কিছু আছে কি না তাহা আমার জানিবার কোন আবশ্যক নাই। আমি এই মাত্র জানি, তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, মনুষ্য মনুষ্যকে তাহা দিতে পারে না। তোমার মত স্নেহ, তোমার মত ভালবাসা, তোমার মত গুণ কোন্ মানুষের আছে? তুমি মানুষের মধ্যে দেবতা। আমি ক্ষুদ্র বালিকা, তোমার মত দেবতার কেমন করিয়া পূজা করিতে হয় তাহা আমি জানি না। কিন্তু তোমার দাসী হইয়া থাকিতে পাওয়ায় যে কত সুখ তাহা আমি বেশ জানি। আমি তোমার দাসী; দাসীকে তুমি পায়ে ঠেলিবে কেমন করিয়া? কিন্তু তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

"কাঁদিতেছি যে কেন তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু তাহা না বলিয়াও আর থাকা যায় না। শুন সুরবালা, তুমি আমার আপন হইতেও আপন, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ। এই দেখ সুরবালা আমি এই নির্জ্জনে তোমারই ছবি বুকে ধরিয়া বসিয়া আছি।"

রমাপতি ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া দেখাইলেন। সুর-বালার বদন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! রমাপতি বলিতে লাগিলেন,—

"সুরবালা! তুমি আমার অন্তরে ও বাহিরে; তুমিই আমার ধ্যান ও জ্ঞান। কিন্তু সুরবালা! তোমাকে আমি সকল কথাই জানাইব, কোন কথাই আমি লুকাইব না। আমি বড়ই অভাগা; কিন্তু আমি চিরদিন এমন অভাগা ছিলাম না। আমার এই হৃদয়ের এক রাণী ছিলেন। সে দেবী আজি নাই। আজি দুই বৎসর হইল আমার সেই দেবী আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আমি সেই অবধি অভাগা ও দীন-হীন হইয়াছি। সত্য কথা তোমায় বলিব। সেই দেবীর স্মৃতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ। আমার হৃদয় সেই দেবীর অভাবে মরুভূমি হইয়াছে। সুরবালা! তুমি স্বর্গের দেবী। আমি তোমাকে লইয়া কোথায় রাখিব? আমার এ পোড়া হৃদয়ে আর তোমার আসন পাতিব না। তাই বলি-তেছি দেবি, আমার নিকটে তোমার স্থান হইবে না।"

রমাপতি নীরব হইলেন। সুরবালা অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না। তাহার পর সহসা রমাপতির চরণদ্বয় উভয় বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া সেই চরণেই মুখ রাখিয়া বলিলেন,—

"তোমার এই গুণে, তোমার এই দেবত্ব দেখিয়া

আমি তোমার দাসী হইয়াছি। তোমার এই যে সরলতা, তোমার এই যে ভালবাসার স্থায়িত্ব, বল দেবতা, তুমিই কি আর কোথায় এমন দেখিয়াছ? তোমার এই গুণে জগৎ তোমার বশ, আমি তো কোন ছার কীট। তোমার চরণ আমি ছাড়িব না। দাসীকে তোমার চরণে স্থান দিতেই হইবে।"

রমাপতি অতি যত্নে সুরবালাকে উঠাইলেন এবং বলিলেন,—

"আমি যে আজিও বাঁচিয়া আছি, সুরবালা, সে কেবল তোমারই কৃপায়। তোমার স্নেহ, তোমার মমতা, তোমার রূপ এবং তোমার গুণ আমাকে বড় দুরাশা-সাগরে ভাসাইয়াছে। এখন যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তোমাকে না পাইলে আর বাঁচিতে পারিব না। এ জীবন রাখিয়াছ তুমি—ইহা তোমারই সম্পত্তি। তুমিই আমার সুখের কেন্দ্র। তোমার সন্তোষের জন্যই এখন আমার জীবনে মায়া। তোমাকে পাইলে আমার দগ্ধজীবন পুনর্জীবিত হইবে; কিন্তু বল সুরবালা, আমাকে লইয়া তোমার কি হইবে?"

সুরবালা উত্তর দিলেন,—

"আমার যে কি হইবে, তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? তোমাকে যদি আমি সুখী করিতে পারি, তোমাকে যদি আমি হাসাইতে পারি, তোমাকে

যদি আমি আনন্দিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমার আশার পূর্ণ তৃপ্তি হইবে, আমার সুখের সীমা থাকিবে না; তোমার সুখেই আমার সুখ, তদ্ভিন্ন অন্য সুখের কামনা এ দাসীর নাই।"

তখন সস্নেহে রমাপতি সুরবালাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

"ধন্য এ জীবন! সুরবালা, যে অভাগা ছিল, সে এখন তোমার কৃপায় পরম ভাগ্যবান। এ অধম আজি হইতে তোমারই দাস।"

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বড়ই সমারোহে রমাপতি ও সুরবালার বিবাহ হইল। এমন সমারোহ, এত ধূমধাম ইহার পূর্ব্বে সে অঞ্চলের লোকেরা আর কথন দেখে নাই। নানাবিধ বাদ্য, নৃত্য, গীত, ভোজ, আলোক, দানাদি উৎসব ব্যাপারে কয়দিন নগর মহোচ্ছাসময় হইল। প্রায় লক্ষ মুদ্রা এই বিবাহ-কাণ্ডে ব্যয়িত হইল এবং সমস্ত নগর এক পক্ষ কাল মহানন্দে মগ্ন রহিল।

অদ্য ফুলশয্যা। যে প্রকোষ্ঠে নব দম্পতীর পুষ্পবাসর হইবে, তাহার শোভার সীমা নাই। তথায় নানাবিধ সুরম্য স্ফাটিক আধারে আলোক-মালা জ্বলিতেছে। সর্ব্ববিধ গন্ধময় পুষ্পরাশিতে সে গৃহ সুন্দররূপে সমাচ্ছন্ন। ভিত্তিগাত্রে মনোহর ফুলমালাসমূহ সুচারুরূপে সুসজ্জিত। দ্বার ও বাতায়ন-সমূহে পুষ্পের যবনিকা সমূহ বিলম্বিত প্রকোষ্ঠের স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব-পাত্রে সুদৃশ্য পুষ্প-গুচ্ছসমূহ সংস্থাপিত। প্রকোষ্ঠমধ্যে এক অতি শোভাময় পর্য্যঙ্ক। তাহার উপর স্বর্ণ-সূত্র-সমন্বিত শয্যা, তাহার আস্তরণ-প্রান্তে মুক্তামালার ঝালর। সেই পর্য্যঙ্কে সর্ব্বভূষণ-সমাচ্ছন্নকায়া সুরবালা এবং রমাপতি সমাসীন।

বিধাতঃ! তোমার অচিন্ত্য লীলার রহস্যোদ্ভেদ করিবার ক্ষমতা ক্ষুদ্র মানবের নাই। তোমারই কৃপায়, যে রমাপতি নিতান্ত দীনহীন ছিল, সে আজি এই বিপুল বিভবের সর্ব্বেশ্বর। যে ব্যক্তি কিছু দিন পূর্ব্বে আপনাকে নিতান্ত দীনহীন বলিয়া মনে করিত, সে আজি আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে অতি সামান্য দাসত্ব যাহার জীবিকা ছিল, আজি শত জন তাঁহার আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে; সে আজি অচিন্ত্যপূর্ব্ব সুখসৌভাগ্য সংবেষ্টিত। বিজ্ঞান আমাদিগকে শিখাইতেছে, যে স্থানে একদা সুবিস্তৃত সাগর-সলিল লহরী লীলা বিকাশ করিত, তথায় এক্ষণে সমুন্নত, সুকঠিন, শুষ্ককায় গিরিরাজ দণ্ডায়মান। যে স্থান এককালে মকর কুম্ভীরাদি জীবের লীলা-ক্ষেত্র ছিল, তাহা এক্ষণে সিংহ, তরক্ষু, ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ-সঙ্কুল হইয়াছে। হে বিধাতঃ! এরূপ অচিন্ত্যনীয় বিপর্য্যয় যদি তুমি ঘটাইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার হস্তে মানবের এতাদৃশ দশাপরিবর্ত্তনে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। ভাগ্যবান রমাপতি আজি সর্ব্ব সৌভাগ্যের সম্পূর্ণ অধীশ্বর। আজি হইতে রাধানাথের বিপুল বিভব তাঁহার বাসনার অধীন। সর্ব্বোপরি আজি হইতে সুন্দরী-কুল-কমলিনী, সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপা, রমাপতির প্রেমের কেন্দ্র, আনন্দের আধার, সুরবালা তাঁহার আপনার।

কিন্তু এ সময়ে, সুকুমারী, কোথায় তুমি? দেখ তোমার সেই রমাপতির আজি একি বিস্ময়াবহ পরিবর্ত্তন। দেখ, তোমার সেই চিরাধিকৃত স্থানে আজি আর এক নবীনা বিরাজ করিতেছেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু নবদম্পতী এখনও নিদ্রার অধীনতা স্বীকার করেন নাই। এরূপ দিনে কে কোথায় তাহা করিয়াছে? যদি কেহ তাহা করিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহাদের বিবাহই অসিদ্ধ। দম্পতী নিদ্রাগত হন নাই বটে, কিন্তু অলসিত ও অবসিত হইয়াছেন। প্রেমের অনর্থক বাক্য, এক কথার শত পুনরুক্তি, আশার আশ্বাস, আনন্দের অসীমতা, হৃদয়ের পূর্ণতা প্রভৃতি প্রেমারম্ভকালের যেমন যেমন বিধান আছে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোনই ত্রুটি হয় নাই। তবে এতক্ষণ কথাবার্ত্তা যেরূপ খরস্রোতে ও সমুৎসাহে চলিতে ছিল, তাহা এখন অনেক মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। শেষ রাত্রিকালে পক্ষীকূজনের যেমন এক নূতনবিধ ধ্বনি হয়, এখন তাহাই হইতেছে। গৃহমধ্যস্থ আলোকসমূহ কেমন সাদা সাদা হইয়া পড়িয়াছে! এইরূপ সময়ে সুরবালার একটু নিদ্রাবেশ হইল।

তখন রমাপতি ভাবিতে লাগিলেন "হায়! কি করিলাম? ইচ্ছা করিয়া এ সাধের শিকল কেন পায়ে পরিলাম? আজি আমি কাহার জিনিষ কাহাকে দিলাম?

ইহাতে কি আমি সুখী হইব?” ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“সুখী হইব যে তাহার আর সন্দেহ কি! আজি আমার যে সুখ, জগতে এমন সুখ আর কাহার আছে? আমি তো আজ ধন্য হইলাম। সুরবালা যাহার স্ত্রী হইল, ইহজগতে সে তো স্বর্গসুখ ভোগ করিবে। এত রূপ, এত গুণ, এত ভালবাসা আর কোথায় কেহ দেখিয়াছে কি? সেই সুরবালা আজি হইতে আমার!” আবার কিছুকাল চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“কিন্তু আমার যে ছিল, সে আজি কোথায়? আমার সে সুকুমারী কোথায় গেল? আমি তো তাহাকে ভিন্ন জানিতাম না, তাহাকেই তো প্রাণ লুটাইয়া ভালবাসিয়াছিলাম। এ দেহ, এ প্রাণ তো তাহারই। তাহার সে ভালবাসার আদি নাই, অন্ত নাই। তখন একে একে আমূল পূর্ব্বকথা মনে পড়িতে লাগিল। সুকুমারীর সহিত বিবাহ; বিবাহের পর ফুলবাসরে সুকুমারীর সহিত প্রথম পরিচয়; তাহার হৃদয়ের অপার্থিব উদারতা, তাঁহার প্রেমের অমেয় গভীরতা, তাঁহার পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য, সকল কথাই ক্রমে ক্রমে মনে পড়িল। আর মনে পড়িল, তাঁহার সেই দুরাবস্থার কথা। ছিন্ন-কন্থাবিস্তৃত তৈলাক্ত মলিন উপাধানযুক্ত শয্যায় তাঁহারা শয়ন করিতেন; সুকুমারী রন্ধন করিতেন, ঘর ঝাঁইট দিতেন, বাসন মাজিতেন, কূপ হইতে কলসী করিয়া জল

তুলিতেন; পরিতে হইবে বলিয়া ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করিতেন; না করিতেন কি? স্বর্ণ ও রৌপ্যভূষণ কখন সুকুমারীর অঙ্গে উঠে নাই, ছিন্নভিন্ন কার্পাসবস্ত্র কথঞ্চিৎ রূপে তাঁহার দেহাবরণ করিত মাত্র। আর আজি? আজি যে নবীনা সুকুমারীর স্থান অধিকার করিয়াছে, তাঁহার দেহের সর্ব্বত্র মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কার; গৃহকর্ম্ম স্বহস্তে সম্পন্ন করা দূরে থাকুক, কিরূপ প্রণালীতে তাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাও তিনি জানেন না। সুকুমারীর শত বস্ত্রের মূল্য একত্রিত হইলে যত হয়, তদপেক্ষাও তাঁহার পরিধানবস্ত্র অধিক মূল্যবান। দশজন দাসী তাঁহার আজ্ঞাপালনে ব্যস্ত, অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহার সুখসংবিধানে নিযুক্ত। তখন রমাপতি ভাবিতে লাগিলেন,—'আমার সেই সুকুমারী, আমার সেই দুঃখিনী সুকুমারী আর নাই। এত কাঁদিয়া, এত দেহপাত করিয়াও আর তাহার দেখা পাইলাম না। সে আর ইহ-জগতে নাই। ইহ জগতে নাই, কিন্তু আর কোথাও সে নাই কি? আত্মার তো ধ্বংস নাই! তাহার দেহলয়ের সহিত তাহার আত্মার লয় কখনই হয় নাই। তবে সুকু-মারী, দেবি! তুমি দেখিতেছ কি, ঐ স্বর্গধাম, তোমার বাসস্থান, ঐ স্বর্গধাম হইতে দেখিতেছ কি, তোমার সেই রমাপতি কেমন শঠ, কেমন প্রবঞ্চক, কেমন বিশ্বাসঘাতক?"

সহসা সেই প্রকোষ্ঠমধ্যস্থ নিষ্প্রভ আলোকে রমাপতি

দেখিলেন যেন গৃহের ভিত্তিতে একটা অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তির ছায়া পড়িল। সেই সুরক্ষিত পুরীর রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে অপর মনুষ্যের ছায়া! রমাপতি মনে করিলেন, হয় ত কোন দাসী, যাহারা পরিহাস করিতে পারে এমন কোন পরিচারিকা গৃহমধ্যে আসিয়া থাকিবে। তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং চীৎকার করিয়া কহিলেন,—

"কে? কে ওখানে?"

কেহ উত্তর দিল না। তাঁহার নেত্র-সম্মুখস্থ ছায়া সরিয়া গেল না, কেবল একটু নড়িল মাত্র। সুরবালার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। বলিয়া উঠিলেন—

"কি কি? ভয় পাইয়াছ নাকি?"

রমাপতি বলিলেন,—

"ভয় নহে, ঐ দেখ কাহার ছায়া।"

সুরবালা বলিলেন,—

"কই, কই?"

ছায়া এবার সরিতে লাগিল। যে ছায়া ভিত্তিগাত্রে লাগিয়াছিল, তাহা ক্রমে হর্ম্ম্যতলসংলগ্ন হইল।

রমাপতি বলিলেন,—

"এই যে! ঐ যায়!"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি শয্যাত্যাগ করিলেন এবং যে দিকে লোক থাকিলে সেরূপ ছায়াপাত হইতে পারে সেই দিকে চলিলেন। এই প্রকোষ্ঠের

পার্শ্বে আর একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল। সেই প্রকোষ্ঠে একটী সুবৃহৎ সমুজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। উভয় প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী দ্বার উন্মুক্ত ছিল। সেই দিকেই মনুষ্য থাকা সম্ভব মনে করিয়া, রমাপতি সেই দিকেই আসিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর না হইতে, সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি "সুকুমারি সুকুমরি" শব্দে চীৎকার করিয়া সেই হর্ম্যতলে পতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরবালাও আসিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু কিছুই দেখিতে বা বুঝিতে পারিলেন না। তখন অতি যত্নে তিনি রমাপতির শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

অচিরে রমাপতি সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"সুকুমারি, সুকুমারি! এতদিন পরে আমার কথা তোমার মনে পড়িল? না না, তুমি সুরবালা। সুরবালা, সুরবালা, সুরবালা, আমার সুকুমারী কোথায় গেল?"

সুরবালা বলিলেন,—

"তুমি কি বলিতেছ? সুকুমারী তো আমার দিদির নাম। তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ, এ কথা কি সম্ভব?"

রমাপতি বলিলেন,—

"তাহা আর বলিতে? তুমি আমার সম্মুখে রহিয়াছ তাহা যেমন সত্য, আমার সুকুমারীকে দেখাও তেম-

নই সত্য। কিন্তু কোথায় সুকুমারী? সুরবালা, সন্ধান কর, বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিবে, দেখ কোথায় সুকুমারী।"

সেই রাত্রিশেষে সেই সুবিস্তৃত ভবনের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল। যাহা হইবার নহে তাহা হইল না, সুকুমারীর কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না! কেবল দেখা গেল, সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের একটি দ্বার উন্মুক্ত আছে। সে পথ দিয়া কেহ আসিয়া ছিল বলিয়া কেহই মনে করিল না সকলেই রমাপতির মনের বিকার বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

তখন সুরবালা রমাপতিকে বলিলেন,—

"তুমি সারাদিন সারারাত দিদির কথাই ভাব। রাত্রে শুইয়া শুইয়াও হয় তো তাই ভাবিতেছিলে; তাহাতেই হয় তো এ ভ্রম হইয়া থাকিবে।"

রমাপতি এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু প্রাতে সকলে দেখিল রমাপতি বাবুর মূর্ত্তির ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাধানাথ বাবুর সুবিস্তৃত সৌধমালার অনতিদূরে একটী পুষ্করিণী ছিল। সেই সরোবরে কোন সময়ে দুইটী বালক বালিকা ডুবিয়া মরিয়াছিল। সেই শোকাবহ ঘটনার পর হইতে, লোকে ইহারে 'মরার পুকুর' নাম দিয়াছে। নাম যাহাই হউক, এই দুর্ঘটনার পর হইতে সন্নিহিত জনসাধারণের মনে একটা বড় ভীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং পরম্পরাগত স্ত্রী-রসনাসৃষ্ট বিবিধ ভয়াবহ কাহিনী সেই ভীতি আরও সংবর্দ্ধিত করিয়াছিল। এ জন্য সেই পুষ্করিণীতে মনুষ্য যাতায়াত করিত না। কাজেই একদা যাহা পরম শোভাময় ও নয়নরঞ্জন ছিল, তাহা এক্ষণে পরিত্যক্ত সুতরাং শ্রীভ্রষ্ট ও বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। পুষ্করিণীর সোপানাবলী এক্ষণে ভগ্ন, তাহার চারিদিক নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরুগুল্মে পরিপূর্ণ। সেই সকল বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া পুষ্করিণীর ভূরিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তীরের কোন কোন লতা মুখ বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রমে জলের উপর অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বকালে যাহাই

থাকুক, বর্ত্তমান কালে যে এই পুষ্করিণীর অবস্থা বিশেষ ভীতিজনক তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই পুষ্করিণীতে লোক-জন আসিত না। কিন্তু আজ এই সন্ধ্যার প্রাক্কালে, এই জনহীন ও ভয়সমাকুল সরোবরের মধ্যভাগে অবগাহন করিয়া এক শ্যামাঙ্গী যুবতী গাত্র ধৌত করিতেছে। যুবতীর বয়স ২৪।২৫ হইতে পারে। তাহার বদনে উৎসাহ ও দৃঢ়তার রেখা সমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত। তাহার দেহ মাংসল কিন্তু কোমলতা বর্জ্জিত। তাহার নেত্রদ্বয় উজ্জ্বল ও পাপবাসনা-ব্যঞ্জক। যুবতী নানা ভঙ্গীতে অঙ্গমার্জ্জনী লইয়া দেহের সর্ব্বস্থান সযত্নে সজ্ঘর্ষণ করিতেছে। অবিশ্রান্ত ঘর্ষণেও যে দেহের কৃষ্ণত্ব বিদূরিত হইবার নহে, এ কথা হয় তো যুবতী বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না। আশ্চর্য্য ভীতিহীনতার সহিত যুবতী বহুক্ষণ বিবিধ বিধানে আপনার শ্যামকায়া ও পরিধানবস্ত্র তত্রত্য সলিলে বিধৌত করিল। তাহার পর তীরসন্নিধানে আসিয়া তথায় যে পিত্তল কলস পড়িয়াছিল তাহা উত্তমরূপে মার্জ্জিত করিল। পরে আবার জলে অবতরণ করিয়া তাহা জলপূর্ণ করিল। তাহার পর বামকক্ষে কলস গ্রহণ করিয়া এবং আপনার পরিধানের নিম্নভাগ সুবিন্যস্ত করিয়া দিয়া যুবতী ধীরে ধীরে সেই ভগ্ন সোপানে অতি সাবধানতার

সহিত আরোহণ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর কিয়ৎকাল যেরূপ গাঢ় ও মলিন অন্ধকার দেখা দেয়, এখন তাহা দেখা দিয়াছে। সর্ব্বাশঙ্কা-বিরহিতা যুবতী, অন্ধকার, জনহীনতা, বন, ভয়জনক কিংবদন্তী সকলই উপেক্ষা করিয়া, কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে, এক মনুষ্যমূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং বলিল,—

"কে ও, রামলাল? কতক্ষণ?"

পুরুষ বলিল,—

"আধ ঘণ্টারও উপর বাপরে, এমন গা ধোওয়ার ঘটা কখন দেখি নাই; তোমার যে রূপের নেশায় এ গোলাম পাগল, তা আর অমন করিয়া ঘসিয়া মাজিয়া বাড়াইও না ভাই; তোমার পায়ে পড়ি।"

যুবতী বলিল,—

"পাগল এখনও হও নাই বলিয়া আমার এমন ঘসা মাজা করিতে হইতেছে। ছিঃ, তোমার কেবল কথা!"

রামলাল বলিল,—

"কালি, এততেও তোমার মন পাইলাম না! হয় তো তোমার পায়ে প্রাণ না দিলে, তুমি বুঝিবে না আমি তোমার জন্য কেমন পাগল। ভাল এবার তাহাই রিয়া দেখাইব!"

যুবতীর নাম কালীমতি, কি কালীতারা, কি কালী-

পর আমার একটু সাহায্য করিতে হইবে। তাও কি চাই তোমাকে দিয়া হবে না? তোমার যদি এতটুকু ভরসা নাই, তবে তুমি এ কাজে নামিয়াছিলে কেন? আর আমাকেই বা এমন করিয়া মজাইলে কেন?"

রামলাল বলিল,—

"তা তুমি যা বলিবে, তাই আমি শুনিব। তুমি আমাকে যে দিকে চালাইবে, আমি সেই দিকেই চলিব; তাতে আমার অদৃষ্টে যা হয় হউক। তা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম কি, বলি বিষ টিষ খাওয়াইয়া কাজ শেষ করা হবে তো?"

কালী অতি ক্রোধের সহিত বলিল,—

"তোমার মাথা, আহাম্মক, ভেড়াকান্ত। সে ভাবনা তোমায় ভাবিতে হইবে না। এখন যা যা বলি শুন। ঠিক সেই রকম কাজ চাই। না যদি পার, ভাই, তা হলে তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত।"

রামলাল বলিল,—

"কেন ভাই, এত শক্ত কথা বলিতেছ? বল কি বলিবে। যা বলিবে, তাই আমি করিব।"

তখন কালী ও রামলাল খুব কাছাকাছি হইয়া ফুসফুস করিয়া অনেক কথা কহিল। তাহার পর রামলাল বলিল,—

"তোমার ভিজে কাপড় গায়ে শুকাইয়া গেল, এখন বাড়ী যাও। আমি ঠিক সময়ে হাজির হইব।"

কালী বলিল,—

"দেখিও, সাবধান। একটু এদিক ওদিক হয় না যেন।"

রামলাল বলিল,—

"সে জন্য ভয় নাই আমি ঠিক সময়ে আসিব।"

তাহার পর এক দিকে রামলাল ও অপর দিকে কালী প্রস্থান করিল।

---

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শশী ভট্টাচার্য্য যাজক ব্রাহ্মণ। লোকটার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেখিতে কৃষ্ণকায়, উচ্চদন্ত, ক্ষুদ্রনেত্র, সুতরাং সুপুরুষ নহেন। ব্রাহ্মণের শাস্ত্রাদি কিছু দেখা শুনা আছে; বিশেষতঃ দশকর্ম্মে তিনি বিশেষ নিপুণ। তাহার অবস্থা বড় মন্দ। বাসগৃহ এক-খানি সামান্য খড়ের ঘর, ঘরের সম্মুখে একটু ছোট উঠান, সেই উঠানের এদিকে ওদিকে কয়েকটা লাউ কুমড়ার গাছ, তাহার চারিদিকে কঞ্চির বেড়া। অবস্থা মন্দ হইলেও, গ্রামের লোকেরা ব্রাহ্মণকে বড় শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। তাহার স্বভাব চরিত্র বড় ভাল। তাঁহার কোন দোষের কথা কেহ কখন শুনে নাই ও বলে নাই। কালী নাম্নী যে যুবতী স্ত্রীলোকের কথা এখনই হইতেছিল, সে এই ব্রাহ্মণের স্ত্রী। ব্রাহ্মণের ফাটা পা, গুম্ফহীন বদন, শিখাশোভিত শির, নস্যপূর্ণ নাসা, পুণ্ড্রযুক্ত ললাট ইত্যাদি কুলক্ষণে কালী বড় নারাজ ছিল। এ সকল কুলক্ষণ ছাড়া, তাঁহার আরও কিছু মহৎ দোষ ছিল। তিনি বড় ধার্ম্মিক এবং নিয়ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন। এ মহৎ দোষ কালী মোটেই

পছন্দ করিত না। কাজেই সতত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর মনান্তর চলিত। ব্রাহ্মণ বড় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ; এজন্য তিনি আপনার পত্নীকেও ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণা দেখিতে ইচ্ছা করিতেন। কালী এরূপ ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের কোন ধার ধারিত না; সুতরাং সময়ে সময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কালীর উপর নিতান্ত বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কালীরও বড় বাড়াবাড়ি ছিল। কালী বেলা ৪টার সময় ঘাটে যাইত, রাত্রি নয়টা বাজাইয়া বাটী ফিরিত। কালী, সময় নাই, অসময় নাই, ঘরকন্নার কাজ নাই, অকাজ নাই, যখন তখন বাহিরে যাইত এবং দুই তিন ঘণ্টা কাটাইয়া আসিত। ব্রাহ্মণ এ সকল কারণে সদাই খিট্ খিট্ করিতেন। কালী তাহাতে বড় জ্বালাতন হইত এবং কখন মাথা কুটিয়া কখন বা কাঁদিয়া জিতিত।

আজি কালী সন্ধ্যার অনেক আগে গা ধুইবার ওজরে বাহির হইয়াছে, এত রাত্রি হইল, এখনও বাটী ফিরিল না। ভট্টাচার্য্য চটিয়া লাল হইয়া বসিয়া, ঘন ঘন নস্য লইতেছেন। তিনি মনে মনে ঠিক করিয়াছেন যে, আজি কালীরই একদিন কি তাঁহারই একদিন। আজি ব্রাহ্মণ কালীকে বিলক্ষণ শিক্ষা না দিয়া ছাড়িবেন না। কপালে যাই থাকুক, তিনি আজি কালীর খাতির রাখি-বেন না। কিন্তু এ স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক; কালী যতই অন্যায় কাজ করুক এবং ভট্টাচার্য্য

মহাশয় কালীর উপর যতই রাগ করুন, তিনি কালীকে বেজায় ভাল বাসিতেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সেটা কালী মোটেই গণনায় আনিত না; ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেও অনেক সময়ে তাহা বুঝিতে পারিতেন না। কিসে কালী সুখে থাকিবে, কিসে কালীর খাওয়া পরার কষ্ট হইবে না, কিসে কালীর গায়ে দুই একখানা সোণা রূপার অলঙ্কার উঠিবে, কিসে নিজের পাতের মাছখানা না খাইয়া, কালীর জন্য রাখিয়া যাইবেন, কিসে যজমানের বাড়ী ফলাহারে না বসিয়া, নিজে না খাইয়াও, বিলক্ষণ এক পাত্র কালীর জন্য আনিতে পারিবেন, ইত্যাদি ভাবনা তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন। তিনি জানিতেন এরূপ ব্যবহার না করিয়া তিনি থাকিতে পারেন না বলিয়াই করেন। ইহার মূলে যে বিলক্ষণ ভালবাসা আছে, তাহা তিনি বড় একটা মনে করিতেন না। কালী ভাবিত, "হতভাগা, মড়িপোড়া, পোড়ারমুখো বামুন, ওর আবার ভালবাসা। আমার পোড়া কপাল তাই ওর হাতে পড়েছি।"

রাত্রি ঢের হইয়া গিয়াছে। তখন হেলিতে দুলিতে, ঘড়ার জল থকাস্ থকাস্ করিয়া নাচাইতে নাচাইতে ভট্টাচার্য্য-সীমন্তিনী গৃহাগতা হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শশি ঠাকুরের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—

"বেরো কালামুখী, বেরো আমার বাড়ী থেকে।"

অন্য দিন হইলে, কালী বিলক্ষণ মাত্রা চড়াইয়া কাপ্তেনি মহাজনদের হিসাবে সুদ ও কমিশন সমেত হিসাব করিয়া, জবাব দিয়া তবে ছাড়িত। কিন্তু আজি ভট্টাচার্য্যের কোন অজ্ঞাত পুণ্যফলে, কালী বিলক্ষণ দয়া করিয়া উত্তর দিল,—

"এত রাগ করা কেন? সারাদিন ঘরের কাজ কর্ম্ম করিয়া একবার বাহিরে যাই; দুটা মেয়ে ছেলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, কাজেই দুটা কথা কহিতে দেরি হইয়া যায়।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবাক হইলেন। কালীর মুখে এমন উত্তর! তিনি রাগভরে শাসন করিবার জন্য খড়ম দেখাইলে, যে কালী সত্য সত্যই খেংরা বাহির করে, দুটা তিরস্কার করিলে, যে কালী তাহার সটীক শিরে লাথি মারিতে আইসে, সেই কালীর মুখে আজি এই উত্তর শুনিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় একেবারে অবাক্ হইলেন। ভাবিলেন এতদিনে মধুসূদন আমার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, এতদিনে দীনবন্ধু আমার এই দুঃখের সংসার সুখের করিয়া দিলেন। ভগবানের ইচ্ছা না হইলে কালীর মতি গতি এমন ফিরিবে কেন? তিনি না পারেন কি? কালীর উত্তর সত্য ও সম্ভব কি না, ব্রাহ্মণ আহ্লাদে সে বিচার করিতে ভুলিয়া গেলেন। তিনি স্নেহস্বরে বলিলেন,—

"ব্রাহ্মণি, তা তো হতেই পারে! সারাদিন সংসারের কাজকর্ম্ম বন্ধ করাইয়া, যদি তোমাকে কখন সুখী করিতে পারি, তবেই তো আমার জীবন সার্থক। তোমার উপর রাগ করিয়া আমি কি সুখ পাই? তোমাকে দুটা রাগের কথা বলিলে আমার যে কষ্ট হয়, তাহা আর কি বলিয়া বুঝাইব? তবে মানুষের নাকি শত্রু অনেক, এই জন্যই সকল কাজে সাবধান হওয়া আবশ্যক। তুমি ছেলে মানুষ; পাছে সকল কথা সকল সময়ে ভাল করিয়া বুঝিতে না পার, এই জন্য দুই একটা সাবধানের কথা, সময়ে সময়ে, তোমাকে বলিয়া দিতে হয়। তা তুমি এখন কাপড় ছাড়। দেখ দেখি সন্ধ্যার আগে তুমি গা ধুইয়াছ, সেই ভিজে কাপড় এখনও তোমার গায়ে রহিয়াছে; এতে অসুখ হবারই কথা। এ কথা যদি তোমাকে আমি না বুঝাই, তবে কে বুঝাইবে বল?"

কাশী, তখন দড়ীদ্বারা লম্বিত এক বাঁসের আল্না হইতে, এক খানি কাপড় হাতে লইয়া একটু অভিমানের হাসি হাসিয়া বলিল,—

"আমি কি তোমার মত পণ্ডিত, যে তুমি যেমন বুঝাইবে, আমিও তেমনই বুঝিব? তোমার মত পণ্ডিত আমাদের এদেশে আর কেহ নাই। আমি যেখানে যাই সেখানেই আমাকে ভট্টাচার্য্য ঠাকুরুণ বলিয়া লোকে কত মান্য করে। তোমার মত পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া, কোন

কথা বুঝিতে হইলে, আমাকে কি রামা হাড়ির কাছে যাইতে হইবে ?”

ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন, কি সৌভাগ্য ! আমার কালীর এমনই দেব প্রকৃতিই বটে ; তবে ছেলে মানুষ ; এতদিন সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। ভগবান্ কৃপা করিয়া এত দিনে আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন, ইহা আমার অশেষ ভাগ্য। বলিলেন,—

“লোকে আমাকে মান্য করে সত্য, কিন্তু লোকে আপন আপন পরিবারকে যেমন করিয়া খাওয়ায় পরায়, যেমন করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে রাখে, আমি যে তোমাকে কিছুই করিতে পারি না, এ দুঃখ আমার মরিলেও যাইবে না।”

সত্যই ব্রাহ্মণের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তখন কালী বলিল,

ছিঃ ছিঃ ! এজন্য তুমি মনে দুঃখ করিতেছ ! তোমার স্ত্রী হইতে পাওয়ায় আমার যে সুখ, বোধ করি, রাজরাণীরও তাহা নাই। দেশের মধ্যে তোমার মত ধার্ম্মিক, তোমার মত মানী আর কে আছে ? অনেক সুকৃতি-ফলে এ জন্মে তোমাকে পাইয়াছি ; নারায়ণ করুন, যেন জন্মে জন্মে তোমাকেই পাই।”

এবার ব্রাহ্মণ সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। সুখের আশায় কালীর সহিত ঘর পাতিয়া অবধি, ভট্টাচার্য্যের

কপালে এমন সুখ একদিনও ঘটে নাই। তাহার চক্ষে জল দেখিয়া, কালা ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিল এবং আপনার বস্ত্রাঞ্চল দিয়া অতি যত্নে তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল,—

"রাত্রি অনেক হইল খাওয়া দাওয়া কর। আজি মল্লিকদের বাড়ী থেকে, ফলারের জন্য, দই চিড়া সন্দেশ দিয়া গিয়াছে। তুমি খাবে বলিয়া তুলিয়া রাখিয়াছি। ওঠ এখন, বেশী রাত্রে খাওয়া তোমার অভ্যাস নয়, আর দেরি করিলে অসুখ হইবে।"

কালী উঠিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আহারের উদ্যোগ করিতে গেল। উদ্যোগ ঠিক হইলে, কালী ভট্টাচার্য্যকে উঠিয়া আসিবার জন্য সাদরে ডাকিল। ভট্টাচার্য্য পিঁড়িতে বসিয়া আহারে নিযুক্ত হইলেন। চিরদিনই তো তিনি দধি চিপিটক আহার করিয়া থাকেন, কিন্তু আজি কি মিষ্ট! আজি তাহার ঘরের ক্ষীণ প্রদীপ কি উজ্জ্বল, আজি তাঁহার পর্ণ কুটীর কিরূপ সর্ব্বসুখময়, আজি তাঁহার গৃহ-সজ্জা কি চমৎকার, আজি তিনি নিজে কি আনন্দময় এবং সর্ব্বোপরি আজি তাঁহার ব্রাহ্মণী কি সুন্দরী মধুর-ভাষিণী এবং লক্ষ্মীস্বরূপা। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, যাহার গৃহে এমন ধন, সে আবার দরিদ্র কিসে?"

আহারাদি শেষ হইলে, তাঁহার সাধের ব্রাহ্মণী তাঁহাকে একটা পান দিলেন। তিনি, কালাকে আহার করিতে

অনুরোধ করিয়া, শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন। কালী স্বামীর পাত্রাবশিষ্ট ভোজন করিয়া ও আবশ্যক কর্ম্ম সমস্ত শেষ করিয়া, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে শয়ন করিল। সে রাত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যেমন নিদ্রা হইল, তেমন সুখে, তেমন সুনিদ্রা তাঁহার জীবনে আর কখন হয় নাই।

---

# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বড় ভয়ানক কাণ্ড! শশী ভট্টাচার্য্য রাত্রে কাটা পড়িয়াছেন। প্রাতে তাঁহার কুটীরের চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। পুলিসের ইনিস্পেক্টর, হেড কনষ্টবল ও কনষ্টবল গস্ গস্ করিতেছে। কুটীর প্রাঙ্গণের অদূরে একটা বনের অন্তরালে, লাস পড়িয়া আছে। লাস একখানি কাপড় দিয়া ঢাকা। ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে রক্তের ঢেউ খেলিতেছে। ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া, যেখানে লাস পড়িয়া আছে সে পর্য্যন্ত, রক্তের ধারা রহিয়াছে। লাসের দুই দিকে দুই জন কনষ্টবল দাঁড়াইয়া আছে।

দূরে এক স্থানে, পাঁচ জন কনষ্টবল বেষ্টিত হইয়া, কালী ও রামলাল বসিয়া আছে। তাহাদের উভয়েরই হাতে হাতকড়ি। কালীর ললাট কুঞ্চিত, ভ্রূযুগল স্ফীত, চক্ষু রক্তবর্ণ, এবং তাহার ভাব নিতান্ত ভীতিশূন্য। রামলাল নিতান্ত কাতর ও অবসন্ন। বহু ক্রন্দন হেতু তাহার চক্ষু লাল। সে অধোমুখ। উভয়েরই পরিধান বস্ত্র রক্তাক্ত। রামলালের বস্ত্রাপেক্ষা, কালীর বস্ত্র অধিক রক্তাক্ত।

অদূরে, একটী বৃক্ষতলে, ইনিস্পেক্টর বাবু, এক জন

প্রতিবাসীপ্রদত্ত, একটা মোড়ায় বসিয়া হাসিতে হাসিতে হুঁকায় পাতার নল লাগাইয়া, তামাকু খাইতেছেন। তাঁহার সম্মুখে রক্ত-রঞ্জিত এক দা। তাঁহার নিকটে কয়েকজন কনষ্টেবল দণ্ডায়মান।

সকল স্থানেই লোক—ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ—লোকের আর সীমা নাই। স্ত্রীলোকেরা ভিড়ের বড় নিকটে যাইতে পারিতেছে না; দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে ও শুনিতেছে। তাহাদের দেখিলে পোড়ারমুখো পুরুষগুলার মন ঠিক থাকিবে না বলিয়া যে সকল যুবতী ও অর্দ্ধবয়সী নারীর বিশ্বাস আছে, তাহারা, গাছের আড়ালে ও অবগুণ্ঠনের অন্তরালে থাকিয়া, নিতান্ত ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া আছে। প্রাচীনারা লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতেছে এবং তাহাই আবার দশগুণ বাড়াইয়া হাত মুখ নাড়িতে নাড়িতে, নবীনাদের নিকটে আসিয়া গল্প করিতেছে; ছেলেরা ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে; তাহাদের মা, বা পিসী, বা মাসী, তাড়া দিয়া, যাইতে বারণ করিতেছে। দুই একটা দুষ্ট ছেলে, তাড়া ও চখ্ রাঙ্গানাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া, লোকের পায়ের ফাঁক দিয়া, গুড়ি গুড়ি আসিয়া যাহা দেখিবার তাহা দেখিতেছে। দুই একজন বৃদ্ধ আপনার যুবক পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, বা ভাগিনেয়কে স্বাক্ষী দিতে হইবে ভয় দেখাইয়া, গোলের নিকটে যাইতে

নিষেধ করিতেছে ; কিন্তু যুবকেরা সে উপদেশে বড় একটা কর্ণপাত করিতেছে না।

ভট্টাচার্য্যের কুটীরের দ্বার হইতে উঁকি দিয়া যাহারা ভিতরে দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহারা সেখানকার রক্তগঙ্গা কাণ্ড দেখিয়া চমকিত হইতেছে। তক্তপোষের উপর হইতে রক্ত গড়াইয়া পড়িয়া ঘর ভাসিয়া গিয়াছে। সুতরাং তক্তপোষের উপরে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন নিদ্রিত ছিলেন, তখনই যে তাঁহাকে কাটিয়াছে তাহার আর ভুল নাই। তাহার পর সেই রক্তের উপর পায়ের দাগ এবং মৃত ব্যক্তিকে ছেঁচড়াইয়া আনার দাগ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

যেখানে লাস সেখানে লোকে কেবল হায় হায় করিতেছে। দুই এক জনের চক্ষু ছল ছল করিতেছে। দুই এক জন সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। শশী ভট্টাচার্য্য নিতান্ত নিরীহ ও শান্ত ব্যক্তি। গ্রামের তাবৎ লোকেই তাঁহাকে ভাল বাসে ও আত্মীয় জ্ঞান করে তাঁহার এইরূপ অপমৃত্যুতে সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত। কিরূপে কাটিয়াছে, কোথায় কিরূপে আঘাত করিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য অনেকে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। লাস কাপড় ঢাকা থাকায় তাহাদের সে ইচ্ছা সফল হওয়ার কোনই সুযোগ হইতেছে না। তাহারা, কৌতূহল নিবৃত্তির অন্য উপায় না দেখিয়া, কখন বা,

কনষ্টবলদের পীড়াপীড়ি করিতেছে, কখন তাহাদিগকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিতেছে। কনষ্টবল মহাশয়েরা কৃপা করিয়া দুই একটা কথা বলিতেছেন। যাহা বলিতেছেন, তাহাতে বুঝা যাইতেছে, লাসের সর্ব্বাঙ্গে, পঁচিশ ত্রিশ স্থানে, সাংঘাতিক আঘাত আছে; তাহার মধ্যে ঠিক গলার নিকট হইতে বুকের উপর পর্য্যন্ত যে এক প্রকাণ্ড আঘাত, তাহা দেখিতে যেমন ভয়ানক তেমনই গুরুতর।

যেখানে কালী ও রামলাল প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছে, সেখানে অনেক লোক। তাহাদের দেখিয়া অনেকেই নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নানা কথা বলিতেছে। একজন ইয়ার যুবা বলিয়া ফেলিল,—

"ফাঁসির কাঠে ঝুলিতে ঝুলিতে ইয়ারকির চূড়ান্ত হইবে বাবা।"

কালী এ কথায় একটুকও বিচলিত হইল না। কিন্তু রামলাল কাঁদিয়া ফেলিল। আর এক উদ্ধত ব্যক্তি নিতান্ত ঘৃণার সহিত বলিল,—

"ডালকুত্তা দিয়া ইহাদের খাওয়ায় না?"

এবার কালী কুপিত ব্যাঘ্রের ন্যায় দৃষ্টিতে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। এক বৃদ্ধা কোন প্রকারে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সে কালীর মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—

"কালামুখী, ধিক্‌জীবনী! তোর গলায় দড়ি।"

কালী এবারেও ভ্রূকুটী করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। আর এক প্রবীণ লোক বৃদ্ধার কথার উত্তরে বলিল,—

"সে কথা আর তোমার বলিয়া দুঃখ পাইতে হইবে না। আর বড় জোর মাস খানেকের মধ্যে গলায় দড়িই হইবে।"

যেখানে শ্রীল শ্রীযুক্ত ইনিস্পেক্টর বাবু বসিয়া আছেন সেখানে, তাঁহার শ্রী-বদনারবিন্দ-বিনির্গত বাক্য-সুধালালসায় অনেকে নিতান্ত উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছে; তিনি কিন্তু বাক্য-বিতরণে নিতান্ত কৃপণ। তাঁহার তদারক সংক্রান্ত লেখাপড়া ও অন্যান্য সমুদয় কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি লাস চালান দিবার জন্য, একখানি গরুর গাড়ি আনিতে কনষ্টবল পাঠাইয়া, অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তিনি বড়লোক জ্ঞানে, লোকে তাঁহাকে, সাহস করিয়া, সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছে না। দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। তিনি দিন-দুনিয়ার মালিকভাবে, প্রশ্নের সিকি খানা, কদাচিৎ আধ খানা উত্তর দিয়া কাজ সারিতেছেন।

কিন্তু কিরূপে এ কাণ্ড পুলিসের গোচর হইল তাহা এখনও বলা হয় নাই। ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর অনতিদূরে সদানন্দ দাস নামে এক কৈবর্ত্তের কুটীর। সদানন্দ কোন কার্য্য উপলক্ষে গ্রামান্তর যাইবে বলিয়া, সে রাত্রি

ভাল করিয়া ঘুমায় নাই। রাত্রি যখন একটা তখন সদানন্দ হাত মুখ ধুইবার জন্য ঘটা হাতে করিয়া বাহিরে আইসে। বাহির হইয়াই সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘর হইতে ধপাস্ করিয়া এক শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে এক বিকট 'মাগো' শব্দ তাহার কাণে যায়। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক ছট্‌ফট্, গোঁ গোঁ, ধপাস্ ধপাস্ দুম্‌দাম্ শব্দ সে শুনিতে পায়। ভট্টাচার্য্য-পত্নীর স্বভাব চরিত্রের কথা এবং ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর মনান্তরের কথা পাড়া প্রতিবাসী সকলেই জানিত। ভট্টাচার্য্যের ঘরের মধ্যে তখন আলো জ্বলিতেছিল। সদানন্দ ঘরের আরও নিকটে আসিয়া শুনিতে পাইল, ঘরের মধ্যে দুইজন লোক ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহিতেছে। গত বর্ষায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘরের এক দিকের দেয়াল পড়িয়া গিয়াছিল। সে দিকে এখনও নূতন দেয়াল দেওয়া ঘটে নাই, দরমার বেড়া দেওয়া আছে মাত্র। সদানন্দ অতি সাবধানে, সেই বেড়ার নিকটে আসিয়া, একটা ছিদ্র দিয়া ভিতরকার ব্যাপার দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যতদূর সে দেখিতে পাইল, তাহাতে তাহার পেটের পীলে চম্‌কাইয়া গেল। সে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া এবং আপনার প্রয়োজন সমস্ত ভুলিয়া গিয়া ঘটি হাতে থানায় উপস্থিত হইল। সে যাহা দেখিয়াছে, শুনিয়াছে ও বুঝিয়াছে সমস্তই সে সেখানে অকপটে ব্যক্ত করিল। তখনই

পুলিসের লোকেরা তাহার সঙ্গে আসিল। রাত্রি তখন প্রায় ৪টা। এই পর্য্যন্ত কথা সদানন্দ দাসের জবানবন্দীতে ব্যক্ত হইয়া ইনিস্পেক্টর বাবুর কলমের গুণে কাগজজাত হইয়াছে। তাহার পর যাহা হইয়াছিল, তাহা পুলিস স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

পুলিস আসিয়া দেখিল, কালী ও রামলাল শর্ম্মা ভট্টাচার্য্যের মৃতদেহ টানাটানি করিয়া বনের দিকে লইয়া যাইতেছে। সে সময়টা জ্যোৎস্না থাকায় তাহাদের দেখার বিশেষ অসুবিধা হইল না। তাহারা, নিকটস্থ হইয়া, কালী ও রামলালকে ধরিয়া ফেলিল। রামলাল প্রথমে পলাইবার, পরে আত্মহত্যা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও, কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সে তখন অকপটে সমস্ত অপরাধ কাঁদিতে কাঁদিতে, স্বীকার করিল। কালীর বিশেষ উত্তেজনায় এবং আপনার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় সে এ কাজে লিপ্ত হইয়াছিল, কালীর সহায়তা ভিন্ন সে আর কিছুই করে নাই, এবং ভট্টাচার্য্যের শরীরে সে স্বহস্তে একটাও অস্ত্রাঘাত করে নাই, একথা সে বিশেষ করিয়া বলিল। কালীও অকাতরে সমস্ত পাপ ব্যক্ত করিল। ভট্টাচার্য্য তাহার সুখের পথে কণ্টক সুতরাং তাঁহাকে মারিয়া ফেলা আবশ্যক মনে করিয়া সে স্বহস্তে দা দিয়া, বারম্বার আঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিয়াছে, এ কথা

সে নির্ভীকভাবে স্বীকার করিল। রামলাল স্বেচ্ছায় কোন কাজ করে নাই। কালীর বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া, সে সামান্য সাহায্য করিয়াছে মাত্র এবং সে না থাকিলেও, কালী একাই সব কাজ শেষ করিত এমন কথা পর্য্যন্ত কালী বলিল।

বেলা যখন ১০টা তখন গাড়ী আসিল। ইনিস্পেক্টর বাবু গাড়িতে লাস উঠাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়ি-বদ্ধ কালী ও রামলালকে চালান দিয়া এবং অন্যান্য বিষয়ের আবশ্যক মত ব্যবস্থা করিয়া, প্রস্থান করিলেন।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িল। ক্রমে ক্রমে সেখানকার লোকের ভিড় কমিতে লাগিল এবং কেহ বা কালীকে গালি দিতে দিতে, কেহ বা শশী ভট্টাচার্য্যের জন্য আক্ষেপ করিতে করিতে, কেহ কেহ বা নিতান্ত দার্শনিক ভাবে মানব-চিত্তের এতাদৃশ দুর্জ্জেয়তার কথা আলোচনা করিতে করিতে এবং কেহ কেহ বা কালী ও রামলালের কাহার কিরূপ সাজা হইবে তাহার বিচার করিতে করিতে, বাটী ফিরিল। কিন্তু কয়েক দিন প্রতিবাসী নরনারীগণ নিরন্তর বিবিধ সঙ্গীতে এই কাণ্ডের আলোচনা করিতে ভুলিল না।

# নবম পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে শশী ভট্টাচার্য্য হত হন, তাহার মাসাধিক কাল পরে, এক দিন সন্ধ্যার অনতিকাল পূর্ব্বে রাধানাথ রায়ের বহ্বায়ত ভবনের অন্তঃপুর-মধ্যস্থ এক সুবৃহৎ ছাতের উপর, রমাপতি পরিভ্রমণ করিতেছেন। রমাপতি একাকী নহেন। তাঁহার বাম করের মধ্যাঙ্গুলি ধারণ করিয়া, এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বালিকা সঙ্গে সঙ্গে বেড়াই-তেছে। স্তবকে স্তবকে ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি বালিকার কপালে, গ্রীবায়, কর্ণমূলে ও আস্যে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে। বালিকার বয়স চারি বৎসর। তাঁহার আকর্ণ বিস্তৃত, স্থূল-সূক্ষ্ম ভ্রূযুগ-তলস্থ আয়ত, সমুজ্জ্বল লোচন, তাহার দেহের অপূর্ব্ব গৌরকান্তি ও লাবণ্যজ্যোতিঃ, তাহার কোমল রক্তাভ বিম্বোষ্ঠের হসিত ভাব এবং তাহার অস্ফুট ও ভঙ্গ, মৃদু ও মধুর, আনন্দ ও হাস্যময় বাক্যাবলী যে দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে, সে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া কখনই থাকিতে পারে নাই। এই বালিকার নাম মাধুরী। পাঁচ বৎসর হইল রমাপতি ও সুরবালা বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন। বিধাতা, তাঁহাদের প্রগাঢ় প্রণয়-বন্ধন দৃঢ়তর

করিবার অভিপ্রায়ে, প্রথমে এই কন্যাসন্তান, এবং তাহার দুই বৎসর পরে একটী সুকুমার পুত্রসন্তান প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি কৃপার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। জগতে যে যে পদার্থ মানবের সুখ-সংবিধানে সমর্থ, তাহার সকলই তাঁহাদের আয়ত্ত। ধনই অনেক স্থলে, ভোগ-বিলাসানুরত বা পরোপকার প্রবণ-হৃদয় মানবের আশা-নিবৃত্তির অনন্য সাধন এবং তৃপ্তির সর্ব্ব-প্রধান উপাদান। সে ধন, প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রমাণে, তাঁহাদের করায়ত্ত। দাম্পত্য প্রণয়, সৎস্বভাব-সম্পন্ন যুবক যুবতীর পক্ষে, সর্ব্বসুখ বিধায়ক সামগ্রী। ভগবৎ-কৃপায় এই সৌভাগ্যবান্ যুগল তাদৃশ প্রণয়ের আদর্শ স্থলাভিষিক্ত হইবার উপযোগী। এই সকল দুর্ল্লভ সুখও শিশু-কণ্ঠোত্থিত অস্ফুট আধ আধ স্বরের-সহিত বিজড়িত না থাকিলে, মধ্যমণিহীনা রত্নহারের ন্যায়, সতীত্ব-সম্পত্তি শূন্যা সুন্দরীর ন্যায়, কপর্দ্দক-মাত্র-বিহীন দাতার ন্যায় এবং সুরভি-কুসুম-পরিশূন্য কণ্টকাকীর্ণ উদ্যানের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল বলিয়া অনেকে বোধ করেন কিন্তু অনুকূল বিধাতৃ-অনুকম্পায় তাঁহাদের সে অভাবও নাই। সুতরাং তাঁহারা সৌভাগ্যশালীগণের শীর্ষস্থানীয়।

কিন্তু জগতে অব্যাহত সুখ সম্ভোগ প্রায় কাহারও অদৃষ্টে সংঘটিত হয় না। তাঁহারা বড় দাগা পাইয়াছেন— বড় ঝড় তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে;

রাধানাথ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী উভয়েই ইহলোক হইতে পলায়ন করিয়াছেন। রমাপতির পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার অনতিকাল পরে, রাধানাথ রায় লীলা সম্বরণ করেন। সেই দারুণ দুর্ঘটনার তিন মাস পরে, সেই দুর্দ্দমনীয় শোক কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইবার পূর্ব্বেই, সুরবালার জননী পতি-পরিগৃহীত পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে দুই সুমহৎ তরুর সুশীতল ছায়াতলে নিরুদ্বেগে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহা আর তাঁহাদের নাই। যে দুই জীবন সংসারের কঠোর সংঘর্ষণ হইতে অন্তরিত থাকিয়া, আনন্দ ও সৌভাগ্য সম্ভোগমাত্র লক্ষ্য করিয়া, সুখে অতিবাহিত হইতেছিল, তাঁহাদের অতঃপর সংসারের সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। যে পর্ব্বতের অন্তরালে তাঁহারা অবস্থিত ছিলেন, তাহা চূর্ণীকৃত হইয়াছে। তাঁহাদের সুখ ও সন্তোষ, আনন্দ ও প্রীতি, ভোগ ও বিলাস-বিধায়ক ব্যবস্থা করা যাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল, তাঁহারা আর নাই। রাধানাথ ভব-রঙ্গভূমি হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, এক উইল পত্রদ্বারা, স্বীয় বিপুল বিভবাদির বিহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই উইল অনুসারে তাঁহার জামাতা রমাপতি সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিত্ব ও সর্ব্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন।

রমাপতি মাধুরীর সঙ্গে বেড়াইতেছেন। মাধুরী তাঁহাকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে বলিলেই হয়;

কারণ সে কখন জোরে চলিয়া পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া যাইতেছে, কখন বা পশ্চাতের পার্শ্বের পদার্থবিশেষে লক্ষ্যবদ্ধ করিয়া, পা ফেলিতে ভুলিয়া যাইতেছে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি বাবুও থামিতেছেন। আর যে তাহার গজর গজর বকুনি, তাহার কথা আর কি বলিব। বেদ কোরাণের বহির্ভূত অনেক গল্প সে করিতেছে। ভাষার উচ্চারণবিধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া, পদস্থাপনের রীতি ও পদ্ধতি উপেক্ষা করিয়া, এবং প্রসঙ্গের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে প্রসঙ্গান্তর অবতারিত করিয়া, মাধুরী ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্রের যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিতেছে। কিন্তু তাহার সেই অসংবদ্ধ ও অযথাব্যক্ত বাক্যাবলী তাহার পিতার কর্ণে অজস্র ধারায় মধুবর্ষণ করিতেছে। স্বভাব-সঞ্জাত অপত্যস্নেহ, তনয়ার তাদৃশ অপরিস্ফুট বচন-বিন্যাস মধুময় করিবার প্রধানতম হেতু হইলেও, মাধুরীর সুস্বরবিজড়িত ভঙ্গ ভাষা নিতান্ত নির্লিপ্ত শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরকেও মোহিত করিতে সমর্থ।

পিতা ও পুত্রী যখন এইরূপ আলাপে নিযুক্ত, সেই সময়ে সুন্দরী-শিরোমণি-স্বরূপা সুরবালা সেইস্থানে সমাগতা হইলেন। তাঁহার অঙ্কে এক নির্ম্মলকান্তি নিরুপম নয়নানন্দ নন্দন। সেই ভুবনমোহন পুত্র দূর হইতে রমাপতি ও মাধুরীকে দেখিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে, মধুরস্বরে, মধুময় হাস্যের সহিত, 'ধূ—ধূ—বা—বা" শব্দে

চীৎকার করিয়া উঠিল। শিশুর নিতান্ত নবীন বাগ্‌যন্ত্র মাধুরীর নাম উচ্চারণ করিতে পারিত না। সে সেই জন্য স্বকৃত অত্যদ্ভুত ব্যাকরণের সহায়তায়, সেই কঠোর শব্দের ভূরিভাগ 'ইৎ' করিয়া, কেবল ধু টুকু বজায় রাখিয়াছিল। শিশুর সেই অমৃতময় বাক্য কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র, রমাপতি ও মাধুরী ব্যস্ততাসহ সেই দিকে ফিরিলেন। রমাপতি দেখিলেন, অপূর্ব্ব দর্শন! সেই রবি-কর-পরিশূন্য, স্নিগ্ধ-ছায়া-রাশি-পরিবৃত, সমুচ্চসৌধ-শিরে; সেই নীড়গামী, নানাদিগ্‌বিহারী, বহুভাষী, বিবিধ জাতীয় বিহঙ্গমবেষ্টিত দৃশ্য মধ্যে; সেই প্রীতিপদ, প্রবহ-মান, সুস্নিগ্ধ, সুশীতল, বসন্তানিল সাগরে, রমাপতি দেখিলেন, সুরবালা, তাঁহার সুরনায়কতুল্য সুকুমার শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, দাঁড়াইয়া! মৃদু মন্দ বায়ু-হিল্লোলে শিশুর কেশের গুচ্ছ নাচিয়া নাচিয়া উড়িতেছে এবং সুরবালার প্রলম্বিত অঞ্চল কেতনবৎ উড্ডীয়মান হইতেছে। বালিকা এখন যুবতী হইয়াছেন। যৌবন-সমাগমে এখন সেই অপার্থিব সৌন্দর্য্য পূর্ণোজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত হইয়াছে। রমাপতি অতৃপ্ত নয়নে সেই লাবণ্য-ময়ীর স্বর্ণকান্তি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন মাধুরী, "বাবা! ডেক ডেক, ঐ মা" বলিয়া সেই দিকে প্রধাবিত হইল। তখন রাজরাজমোহিনী সুরবালা, মাধু-রীর হস্তধারণ করিয়া, অগ্রসর হইলেন। রমাপতিও

কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া, মধ্যপথে সুরবালার সমীপাগত হইলেন এবং বলিলেন,—

"এই বুঝি তোমার শীঘ্র আসা? আঠারো মাসে তোমার বৎসর?"

সুরবালা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তা আমি জানি। এতক্ষণ তোমার হুকুম তামিল করিতে না পারায়, অবশ্যই দাসীর অপরাধ হইয়াছে। আমি আসিতেছি এমন সময়ে পুঁটের মা ছেলের জন্য জ্বরের ঔষধ চাহিতে আসিল। তাহার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে দেরি হইল। তা যাই হউক, দাসী গলায় কাপড় দিয়া হাতজোড় করিয়া, মানভিক্ষা করিতেছে। যদি নিতান্তই হুজুর তাহাকে ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে দাসী শেষে এমন কল খাটাইবে, যে হুজুরের তখন নাকালের সীমা থাকিবে না।"

কিন্তু রমাপতি তখন উত্তর দিবেন কি? সেই রূপসীর মধুর বাক্য, মধুর ভাব, এবং মধুর ভাষা তাঁহাকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। কথায় কি ছাই তখন প্রাণের কথা বাহির হয়? কটা কথা লইয়াই বা ভাষা, কটা ভাবই বা তাহাতে ব্যক্ত হয়! রমাপতি, সে কথার উত্তর দিবার কোন প্রয়াস না করিয়া, খোকাকে কোলে লইবার জন্য হাত পাতিলেন। খোকা সানন্দে লাফাইয়া আসিয়া তাঁহার কোলে পড়িল। রমাপতি বারংবার

তাহার বদন চুম্বন করিলেন। তখনই কয়েক জন ঝি তাহাদের কোন আদেশ আছে কি না জানিবার নিমিত্ত, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রমাপতি, মাধুরী ও খোকাকে লইয়া, ছাতে ছাতে বেড়াইতে আদেশ করিলেন। তখন সুরবালা আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"মানিনীর মান কি ভাঙ্গিয়াছে? না শেষে মানের দায়ে নিজে নাকে কাঁদিতে সাধ আছে?

রমাপতি বলিলেন,—

"সাধ যাহা আছে তাহা দেখিতে পাইবে এখনই। 'অতি দর্পে হতা লঙ্কা' জানতো? দোষ করিলে নিজে, নাকে কাঁদাইতে চাও আমাকে। তোমার মত লোক বিচারক হইলে দেশে সুবিচারের স্রোত বহিয়া যাইবে।"

সুরবালা রমাপতির হাত ধরিয়া, অন্য এক ছাতে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন,—

"আমি বিচারক হইলে এই কপট পুরুষগুলাকে বিলক্ষণ জব্দ করিয়া তবে ছাড়ি।"

রমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,—

"সকলের প্রতিই কি তাহা হইলে ধর্ম্মাবতার সমান বিচার করিবেন? কেহই কি আপনার ন্যায়-দণ্ডের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে না?"

সুরবালা, মুখের হাসি অঞ্চলে চাপিয়া, বলিলেন,—

"কেহ না। যাহাদের মধ্যে সকলেই কপট তাহাদের আবার ছাড়াছাড়ি কি? সকলেরই সাজা।"

রমাপতি বলিলেন,—

"পুরুষ যে অত্যন্ত কপট তাহার আর সন্দেহ কি! তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে শশী ভট্টাচার্য্য কখন কি কালীকে এত ভাল বাসিত?"

সুরবালা কালীর নামোচ্চারিত হইবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, তোমরা—তোমরা দেবতা—আমারা সামান্য মেয়ে মানুষ—আমরা তোমাদের মহিমা কি বুঝিব? তোমরা আমাদের মত ক্ষুদ্র কীটকে পদে দলিত না করিয়া, হৃদয়ে স্থান দেও, এ তোমাদের আশ্চর্য্য দেবত্ব। বলিলেন,—

"জানি না কোন্ স্বর্গে শশী ভট্টাচার্য্যের স্থান হইবে। স্বর্গ যদি থাকে এবং স্বর্গে যদি শ্রেণী থাকে, তাহা হইলে শশী ভট্টাচার্য্য অবশ্যই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে স্থান পাইবেন। আর কালী? নরকেও কি নরক নাই? সে কেন মানবদেহ পাইয়াছিল? বিধাতঃ! তোমার রাজ্যে তাহার জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছ?"

রমাপতি দেখিলেন, ক্রোধে ও হৃদয়ের যাতনায় সুন্দরীর বদন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। লোচনযুগল উজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্! যে হস্ত হইতে কালীর ন্যায় পিশাচীর সৃষ্টি, এই

দেবীও কি সেই হস্তেরই ফল ? সুরবালা আবার বলিতে লাগিলেন,—

"কিন্তু মানবরাজ্যে কালীর ঘোর দুষ্কৃতির কি শাস্তি হইল তাহা আমি জানিতে পাই নাই। তাহার পাপ আত্মা আজিও কি সেই দেহে আছে ?"

রমাপতি বলিলেন,—

"বিচারে কালীর ফাঁসি ও রামলালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হইয়াছে। বোধ হয় আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই কালীর ফাঁসি হইয়া যাইবে।"

সুরবালা চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

"ফাঁসি হইবে ! ফাঁসিই কি তাহার যথেষ্ট শাস্তি ? কিন্তু সে কথায় আমাদের কাজ কি ! যাহা হইবার তাহাই হউক।"

অনেকক্ষণ আর কেহই কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার পর সুরবালা বলিলেন,—

"তোমার সহিত আমার এবার ভারি ঝগড়া হইবে।"

রমাপতি বলিলেন,—

"অপরাধ ?"

সুরবালা মুখ ভার করিয়া বলিলেন,—

"মোকদ্দমার জন্য তুমি কলিকাতায় যাইবে বলিতেছ ; সেখানে দশ পনর দিন দেরি হইবে তাহাও বলিতেছ ; কিন্তু একবারও আমাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়ার কথাটা

বলিতেছ না। বেশ, যাও তুমি, আমি ইহার এমন শোধ তুলিব যে, তোমাকে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতে হইবে!"

রমাপতি বলিলেন,—

"কেন তোমাকে লইয়া যাইব? আমার কি আর কেহ নাই? মনে কর আমার সুকুমারীর সহিত দেখা হইবে।"

সুরবালা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"এমন দিন কি হইবে? ভগবান যেন তাহাই করেন।"

রমাপতি বলিলেন,—

"এমন দিন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই জান বলিয়া এ কথা বলিতেছ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমরা যাহাই মনে কর, সুকুমারী বাঁচিয়া আছেন। মনে কর যদিই কলিকাতায় গিয়া সুকুমারীকে পাই, তাহা হইলে তুমি কি কর?"

সুরবালা নীরব। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর। তাঁহার হৃদয় ভাবে পূর্ণ। অনেকক্ষণ পরে তিনি উত্তর দিলেন।

"কি যে করি তাহা কেমন করিয়া বলিব? সেই দেবী, সেই প্রেমময়ী, সেই শক্তিময়ীকে আমার মন প্রতিদিন অবনত মস্তকে বার বার প্রণাম করিয়া থাকে। সেই দেবীকে যদি সম্মুখে দেখিতে পাই—আহা বিধাতঃ!

তুমি সকলই ঘটাইতে পার, এ অধীনার এ প্রার্থনা কি তুমি পূরণ করিতে পার না?—সেই দেবীকে যদি সম্মুখে দেখিতে পাই, যাঁহাকে প্রতিদিন ধ্যান করি—কল্পনায় যাহার মূর্ত্তি গঠিত করিয়া প্রতিদিন পূজা করি—আমার সেই দিদিকে যদি সম্মুখে দেখিতে পাই, তাহা হইলে—অভীষ্ট দেবীকে সম্মুখে দেখিলে, ভক্ত যাহা করে, আমিও তাহাই করি। তাহা হইলে স্বর্ণসিংহাসন পাতিয়া তাঁহাকে আমার এই দেবতার পার্শ্বে বসাই, স্বহস্তে এই দেবযুগলের চরণ ধৌত করিয়া এই কেশরাশি দ্বারা তাহা মার্জ্জিত করি, এবং ভক্তি গদ্গদ হৃদয়ে দূরে দাঁড়াইয়া সেই দেবযুগলের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করি। কিন্তু সে সৌভাগ্য কি কখন আমার কপালে ঘটিবে?"

রমাপতি মুগ্ধভাবে সুরবালার কথা শুনিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "সত্যই কি সুরবালা মানবী? অস্থি, মাংস, বসা, চর্ম্মধারী মানবশরীর কখনই এবংবিধ মহোচ্চ মনোবৃত্তির আধার হইতে পারে না। এই দেবীর বদনের ভাব, কথার প্রণালী, বাক্যের শক্তি, আলোচনা করিয়া কে বলিবে যে এ সকল উক্তিতে বিন্দুমাত্র কপটতা আছে? কে বলিবে এই সকল ভাব এই দেবীর অন্তরের অন্তর হইতে সমুদ্ভূত নহে?" তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—

"তোমার যে এই দেবভাব, সুরবালা, মনুষ্যলোকে ইহার আর তুলনা নাই। মনুষ্যশরীর লইয়া তোমার

এরূপ ভাব কেন হইল, বহু আলোচনাতেও তাহা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি না!”

সুরবালা বলিলেন,—

“হৃদয়দেব! আমার এভাবে আমি বিস্ময়ের কারণ কিছুই দেখি না। দেবভাব কাহাকে বলে তাহা এ অধম নারী বুঝিতেও অক্ষম। আমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই দিকে প্রধাবিত। যখন হইতে তুমি আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলে আমার চক্ষে পড়িয়াছ, যখন তোমার পত্নীবিয়োগে বিজাতীয় কাতরতা আমি দেখিয়াছি, যখন তোমার সেই দারুণ দুর্বিপাক সময়ের কাহিনী সমস্ত তোমার মুখে শ্রবণ করিয়াছি তখনই তোমাকে দেবতা বলিয়া আমার ভক্তি জন্মিয়াছে। সেই ভক্তি, তোমার দয়া, সরলতা, কোমলতা, বিদ্যা ও রূপ দেখিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া এমন ভাবে উপনীত হইয়াছে যে, আমার হৃদয়ে তাহার আর স্থান হয় না। তখন হইতে কিসে তোমাকে সুখী করিতে পারিব, কিসে তোমার কাতর হৃদয়কে প্রফুল্ল করিতে পারিব, কিসে তোমার হৃদয়কে আনন্দময় করিতে পারিব, ইহাই আমার জীবনের চেষ্টা, লক্ষ্য, বাসনা এবং প্রতিজ্ঞা হইয়াছে। অন্য সাধ আমার জীবনে নাই। তোমার সুখ ভিন্ন, তোমার আনন্দ ভিন্ন, আমার প্রাণের আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। তুমি দেবতা; আমি দেবসেবায় আমার

দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়া আছি। আমার আর স্বতন্ত্রতা নাই। সার্থক আমার জীবন, সার্থক আমার জন্ম। আমার দেবতা আমার পূজায় পরিতুষ্ট হইয়াছেন। আমার প্রাণের বিরস বদনে এখন হাস্যের জ্যোতিঃ দেখা যায়, আনন্দ তথায় এখন খেলা করে এবং সুখ তথায় এখন বিচরণ করে।"

তখন সুরবালা সেই নিশানাথবিরাজিত হৈমকরোজ্জ্বল গগনতলে অশ্রুময় নয়নে সেই স্থানে উপবেশন করিয়া, উভয় বাহুতে রমাপতির পদদ্বয় ধারণ করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—

"আমার ভক্তি ও মুক্তি, সুখ ও স্বর্গ, আশা ও সম্পদ সকলই তুমি। আমি তোমারই দয়ায়, তোমারই চরণ প্রসাদে ধন্য হইয়াছি। আমার দ্বারা—তোমার এই সামান্য দাসীর সামান্য সেবায়, তোমার প্রাণে আবার আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। এ অধম দাসীর পক্ষে ইহার অপেক্ষা আর কিছু প্রার্থনীয় আছে কি? তাই বলিতেছি, তোমারই চরণাশীর্ব্বাদে তোমার এ দাসী ধন্য হইয়াছে।"

তখন রমাপতি সেই স্থানে সুরবালার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার লোচন দিয়া তখন অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে। কোথায় এমন লোক আছে, যে এমন অপার্থিব প্রেমের অধিকারী? এমন প্রেম স্বর্গেও আছে

কি? এ সংসারে রমাপতি তুমিই ভাগ্যবান্! সুরবালা আবার বলিতে লাগিলেন,—

"আমার যাহা ব্রত তাহার শেষ নাই—সীমা নাই। তোমাকে সুখী করাই আমার যোগ ও সাধনা। কিন্তু সুখের তো সীমা নাই। তোমাকে সুখী করিতেছি বটে, কিন্তু সুখের সর্ব্বোচ্চ সোপানে না উঠিতে পারিলে তোমার এ সেবিকার পরিতৃপ্তি নাই। যদি কখন দিদির সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে তোমাকে আরও সুখী করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা তো হইবার নহে। যদি নিজ প্রাণের বিনিময়েও সেই ভাগ্যবতীর সাক্ষাৎলাভ ঘটিত, তাহা হইলে তোমার দাসী এখনই তাহা সম্পন্ন করিত।"

তখন রমাপতি বলিলেন,—

"সুরবালা, তোমার কামনা অতুলনীয়। জগতে এমন প্রেমের তুলনা নাই। তোমারই কৃপায়, যে অভাগা ছিল সে এখন পরম ভাগ্যবান্। একদা এ হৃদয় সুকুমারী-ময় ছিল সন্দেহ নাই; এখনও হৃদয় যে সুকুমারীর স্মৃতি বিসর্জ্জন দিয়াছে, এমন নহে এবং কখন স্মৃতি হইতে যে মূর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে, এমনও বোধ হয় না। কিন্তু সুরবালা, এখন তুমিই আমার জীবন ও মরণ, আশা ও নিরাশা, সম্পদ ও বিপদ সকলই। এ জীবন তোমারই চেষ্টায়, তোমারই কৃপায়, তোমারই জন্য রক্ষিত। সুরবালা! যদি তুমি

আমার এ শুষ্কহৃদয়ে অজস্র ধারে শান্তিসুধা না সেচন করিতে, যদি তুমি এ দগ্ধ তরুতে প্রেমের কুসুম না ফুটাইতে, যদি তুমি এ অন্তর-প্রান্তরে আনন্দের নদী না বহাইতে, তাহা হইলে এতদিন আমার কি দুর্গতি হইত? যে দেবী আমার ন্যায় হীনজনের প্রতি কৃপা করিয়া তাহাকে সুখসাগরে ভাসাইয়াছেন, তিনিই তাহাতে সকল প্রবৃত্তি সজীব রাখিয়াছেন। সুকুমারী মৃত্যু কবলিত হইলেও আমার হৃদয়ে তিনি যে এখনও বাঁচিয়া আছেন, সে কেবল তোমারই যত্নে এবং তোমারই বাসনায়। আমি এখন যে প্রেমের অধিকারী, আমার সৌভাগ্যক্রমে যে আনন্দসাগরে আমি এখন ভাসিতেছি, মানবজন্ম লাভ করিয়া কেহ কখন কোথায়ও তাহা পায় নাই। এমন প্রেমে যে মত্ত, এমন সুখে যে ভাসমান, আর কোন স্মৃতিই তাহার থাকা সম্ভব নহে। তথাপি তাহা তোমারই চেষ্টায় এখনও আমার হৃদয় ত্যাগ করে নাই। কিন্তু, সুরবালা, তুমি ভিন্ন এখন আমার গতি নাই। আমার হৃদয়ে যে সুকুমারী মূর্ত্তি আছেন তাহা তোমার দ্বারাই অনুপ্রাণিত, তোমার তেজে তাহা তেজোময়, তোমার প্রেমে তাহা প্রেমময়। এখন আমার সুকুমারী স্বতন্ত্র সুকুমারী নহে। এখন আমার সুরবালা ও সুকুমারী অভিন্ন ও এক। এখন সুরবালা যদি সুকুমারী না হয়, তাহা লইয়া আমার একদিনও চলিবে না এবং যদি

আমার সুকুমারী সুরবালাময়ী না হয়, তাহা হইলে তাহা লইয়াও আমি একদিনও থাকিব না। অতএব দেবি, তোমার কৃপায় আমি আমার হারাধন সুকুমারীকে অনেক দিন পাইয়াছি। যাহার স্বতন্ত্রতা নাই, তাহা স্বতন্ত্ররূপে পাইবার বাসনা কখন এ ভাগ্যবান মানবের মনেও হয় না।"

সেদিন আর যে সকল কথা হইল তাহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। এই স্বর্গীয় প্রেমের আদর্শ দম্পতী বহুক্ষণ প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।

---

# দশম পরিচ্ছেদ।

অদ্য কালীর ফাঁসি। পূর্ব্ব দিবসেই আলিপুর জেলখানার প্রাঙ্গণে এই ভয়ানক ব্যাপার সংসাধনোপযোগী সমুদয় আয়োজন হইয়াছে। সেই জীবনান্তক, প্রকাশ্যরূপে মানব প্রাণবিনাশক ভয়ানক যন্ত্র, সদর্পে আপনার নিকট বাহু উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বলোক সমক্ষে মনুষ্যঘাতক, অধম জীবিকাবলম্বিত, হৃদয়হীন জল্লাদ বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে। স্বয়ং জজ ও মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরেরা সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত। আর উপস্থিত পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইনস্পেক্টর, সব-ইনিস্পেক্টর, কয়েকজন হেড কনষ্টবল এবং অনেক কনষ্টবল। লোকের জীবনরক্ষার জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তির জীবনান্ত সংঘটিত হইয়াছে কি না, তাহারই সমর্থন করিবার নিমিত্ত, স্বয়ং ডাক্তার সাহেব উপস্থিত। সুতরাং ফাঁসির ঘটা খুব।

চারিদিকে অনেক লোক। লোকে প্রায় তাবৎ প্রাঙ্গণ ছাইয়া গিয়াছে। অনেক লোক, এই ঘটনাস্থলে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে না পাইয়া, বাহিরে

গাছের উপর ও অট্টালিকার চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের আগ্রহই বা কত্। যেন আজি এখানে কি উৎসবই হইবে এবং তাহা দেখিতে না পাইলে, তাহাদের জীবন ও জন্মই বিফলে যাইবে। ধন্য মানবের অদম্য কৌতূহল! যে ব্যাপার স্মরণে শরীর শিহরে, যে লোমহর্ষণকাণ্ড মনে করিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, এবং যাহার আলোচনা করিলে প্রাণ ব্যাকুল হয়, সেই বিকটদৃশ্য দেখিবার জন্য, এত লোকসমারোহ হইয়াছে; একজন মানব—সজীব, সচল এবং সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত মানব, রাজকীয় শক্তির বিরোধে প্রতিকূল চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হইবে জানিয়া, বৎপরোনাস্তি অনিচ্ছা স্বত্বেও, অবনত মস্তকে, ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবে; এই অচিন্তনীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য তথায় লোকে লোকারণ্য। এরূপ বিসদৃশ দৃশ্য দর্শনে হৃদয়ের কোমলতা বিধ্বংসিত এবং পরুষতা সংবর্দ্ধিত হয়, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। তবে জগতের কিছুই নিরবচ্ছিন্ন অকল্যাণকর নহে। নিপাতকারী হলাহলেরও রোগাপনোদনের শক্তি আছে। তাদৃশ চক্ষে এ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে অনুমিত হইতে পারে যে, এতাদৃশ ব্যাপার সম্বন্ধে কৌতূহল নিবারণ করিলে, দর্শকের হৃদয়ে উপস্থিত দৃশ্য নিতান্ত বদ্ধমূল হইয়া স্থায়ী অঙ্কপাত করে এবং তাহাতে সমাজের প্রভূত হিত সংসাধিত হয়। কিন্তু

যাহারা, এই জন্য প্রস্তুত হইয়া, যাতায়াত ক্লেশ স্বীকার করিয়া, হয় ত কিঞ্চিৎ অর্থব্যয়, সময়নাশ ও কার্য্যক্ষতি করিয়া, এই কাণ্ড দেখিতে যায়, তাহাদের কেহই, ইহার ফলস্বরূপে পরিণামে সমাজের হিত সাধিত হইবে, বা হৃদয়ে স্থায়ী অঙ্কপাত হওয়া আবশ্যক ভাবিয়া কথনই যায় না। সুতরাং নিতান্ত জঘন্য কৌতূহল নিবৃত্তি ভিন্ন ইহার অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। মনুষ্য যে পশুরই রূপান্তর এবং মানব হৃদয় যে এখনও পাশব প্রবৃত্তির নিতান্ত বশীভূত, এইরূপ নিষ্ঠুরতায় উৎসাহ তাহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আর অল্পকাল পরেই কালীকে ঐ সম্মুখস্থ মরণ-যন্ত্রে লম্বিত হইয়া, জীবন ত্যাগ করিতে হইবে। রোগ বা কোন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে তাহার দেহ ও আত্মার চিরবিচ্ছেদ ঘটিবে না। মানব আত্মকৃত ব্যবস্থাবলে, প্রকাশ্যরূপে বলপূর্ব্বক তাহাকে হত্যা করিবে। যে অত্যুৎকট অচিন্তনীয় পাপে তাহার হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছে, যে নৃশংস কার্য্য সমাধা করিয়া সে সমাজের বিরুদ্ধে ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছে, মানব-সমাজ, তাহার শাস্তিস্বরূপে, এই দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, সমাজ সংস্থিতির জন্য পাপীর শাস্তি-বিধান নিতান্তই আবশ্যক। সংসারের পাপস্রোত মন্দীভূত করিবার জন্য, পাপাসক্তের বিহিত দণ্ড সতত ও সর্ব্বত্র

প্রয়োজনীয়। কালীর পাপানুরূপ শাস্তি প্রয়োগের অভিপ্রায়েই আজি তাহাকে বিগতজীব করিবার আয়োজন করা হইয়াছে। মানবকৃত বিধিব্যবস্থায় ইহাই তাদৃশ মহাপাপীর চূড়ান্ত শাস্তি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া আছে।

কেহ কেহ এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এইরূপে প্রাণনাশ করিলেই কি এতাদৃশ ঘোর পাপীর পাপোচিত শাস্তি হইয়া থাকে? তাঁহারা বলেন, ভোগের পরিমাণানুসারে শাস্তির গুরুতা ও লঘুতা স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। কালীর ন্যায় পাপীয়সীর বহুকাল ধরিয়া শাস্তি ভোগ করা আবশ্যক এবং সে শাস্তির জ্বালা তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে ও হাড়ে হাড়ে মিশিয়া যাওয়া বিধেয়। যতদিন সে বাঁচিবে ততদিন কদাচ যাহাতে এ শাস্তির কথা, এ যন্ত্রণার স্মৃতি, সে একবারও ভুলিতে না পারে, এমন কোন সাজা, তাহার ন্যায় পাতকীর জন্য নির্দ্ধারিত ও অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। অধুনা তাহার নিমিত্ত যে শাস্তির ব্যবস্থা হইতেছে, বলিতে গেলে, তাহা কেবল দুই মিনিটের শাস্তি। কয়েক দিন---সত্যই কয়েকটা দিনমাত্র, দণ্ডিত ব্যক্তি একটা দুরন্ত বিভীষিকায় উৎপীড়িত হয় বটে; কিন্তু তাহার পর দুই মিনিটে—কেবল ক্ষুদ্র দুই মিনিটের মধ্যে তাহার সকল বিভিষীকা ও শাস্তির অবসান হইয়া যায়। এত বড় অপরাধী, কেবল দুই

মিনিটের শাস্তি ভোগের পর, সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করে এবং তখন সে মানব সমাজের তিরস্কার ও পুরস্কার, আনন্দ ও বিষাদ, সম্পদ ও বিপদ, সুখ ও দুঃখ, জ্বালা ও শান্তি, হাস্য ও রোদন সকল ব্যাপারেরই হাত ছাড়াইয়া যায়। এরূপ দুষ্কৃতির সহিত তুলনা করিলে তস্কর, দস্যু, প্রবঞ্চক প্রভৃতির অপরাধ নিতান্তই লঘু বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাদেরও বহুকাল ধরিয়া অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হয়; অথচ এমন ভয়ানক পাপী, কয়েক দিনের ভয় ও দুই মিনিটের যাতনা ভোগ করিয়া আমাদের হাত হইতে পার পাইয়া যায়, ইহা বস্তুতঃই নিতান্ত হাস্যজনক অব্যবস্থা।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কালী যে পাপ করিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে দুই মিনিটের বেশী শাস্তি ভোগ করিতে হইল না সত্য, কিন্তু সে মানব হৃদয়ে যে ভয়ের সঞ্চার করিয়া রাখিয়া গেল, লোকসমূহকে যে শিক্ষা দিয়া গেল, তাহার জন্য চিরদিনই সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইবে। কথাটা অবশ্যই স্বীকার্য্য; কারণ মরণের অপেক্ষা মরণের ভয়টা বড়ই ভয়ানক। কালী মরিয়া নিজে যত যাতনা ভোগ করুক না করুক, তাহার এইরূপ মৃত্যু দেখিয়া লোকের মনে, এইরূপ কার্য্যের এই ফল বলিয়া যে এক ভয় ও সাবধানতা জন্মিবে, সমাজের পক্ষে তাহা বড়ই কল্যাণকর। কিন্তু তাহাতে কালীর কি? তোমার

কল্যাণ বা অকল্যাণ কালী তো আর দেখিতে আসিবে না; তাহার এত বড় পাপে, তোমরা যে দুই মিনিটের শাস্তি দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছ, তাহার যুক্তি কোথায়? কেন, তাহার অপরাধের অনুরূপ সাজা কি তোমরা দিতে জান না? একটা বেগুন চুরি করিলে তোমরা তাহার নাকে দড়ি দিয়া ঘানিতে ঘুরাইতে পার, আর এইরূপ পতিহন্ত্রীকে দুই মিনিটের বেশী সাজা দিতে পার না? পরকালে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া সাজার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে তোমার কোন অধিকার নাই; কারণ পরকালে কি হইবে তাহা জানিতে তোমার হাইকোর্টের জজদেরও কোন ক্ষমতা নাই। যাহা কেহ জানে না ও বুঝে না, তাহা হিসাবে ধরা যায় না। সুতরাং পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, ফাঁসির পূর্ব্বে কয়দিনের ভয়ই ইহকালে কালীর দণ্ডের প্রধান অংশ। কিন্তু এই কি সাজা। চূড়ান্ত? ইহার চেয়ে কঠিন সাজা কি আর হইতে পারে না? অবশ্যই কঠিনতর সাজা উদ্ভাবিত হইতে না পারে এমন নহে। যেমন অপরাধ তাহার তেমনই দণ্ড হইলে, লোকশিক্ষারও ব্যাঘাত হইবে না এবং ন্যায়েরও সম্মান রক্ষিত হইবে।

কেহ কেহ ইহার অপেক্ষা আরও এক শক্ত কথা বলেন। তাঁহারা বলেন. যাহা তুমি দিতে পার না, তাহা লইবার তুমি কে বাপু? তোমার শত শত জজ,

শত শত আদালত, শত শত পার্লেমেণ্ট এবং শত শত রাজারাণী মিলিয়া, শত শত বৎসর ভাবিলেও, একটা মানুষ তৈয়ার করিবার আইন করিতে পারেন কি? তাহা পারেন না। যাহা গড়িবার তোমাদের ক্ষমতা নাই তাহা ভাঙ্গিতে তোমরা এমন তৎপর কেন? এমন করিয়া আইনের দোহাই দিয়া, নিয়ত মানুষখুন করিতে তোমাদের অধিকার কি?

কেহ কেহ আরও একটা গুরুতর কথা উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন, যাহারা একবার পাপ করিয়াছে তাহারা কি আর কখন ভাল হইতে পারে না? একবার যাহার পদস্খলন হইয়াছে, আবার কি সে সাবধান হইয়া চলিতে পারে না? যদি তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে, ভাবিয়া দেখ, এরূপ অন্যায় নরহত্যায় জগতের যে কত সর্ব্বনাশই ঘটিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। হয়ত সেই মহাপাপী, বাঁচিয়া থাকিলে, হৃদয়ের এমন উন্নতি করিতে পারিত, হয়ত সে সংসারের জ্ঞান ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির এমন সহায় হইত যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তুমি তাহার অপরাধানুরূপ ভাল শাস্তি দিতে পারিলে না, অথচ তাহার আত্মোন্নতি সাধনের কোন সুযোগ করিতে দিলে না, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে তাহাকে অবসর দিলে না এবং তাহার দ্বারা জগতের কোন হিত সঙ্ঘটিত হইতে পারিত, তাহাও

হইতে দিলে না। ইহার নাম বিচার না বিচারের ব্যভিচার ?

কিন্তু আমরা অপ্রাসঙ্গিক কথায় বহুস্থান ব্যয় করিয়াছি। ফাঁসি বিধেয় হউক না হউক, কালীর আজি ফাঁসি। সব প্রস্তুত, নির্দ্ধারিত সময়ও প্রায় উপস্থিত। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর একবার পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন ; তাহার পর জেলখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন কারাগারের সেই লৌহদ্বারের মধ্য হইতে বহু কনষ্টবল এক অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোককে বেষ্টন করিয়া লইয়া আসিতেছে। সকলের দৃষ্টি সেই দিকে সঞ্চালিত হইল। চারিদিক হইতে, 'আসিতেছে, ঐ আসিতেছে,' শব্দ উঠিল। ক্রমে পশ্চাদ্দিকে হাতকড়ি দ্বারা নিবদ্ধহস্ত আসামী, কনষ্টবল বেষ্টিত হইয়া, বধ্যভূমির নিকটস্থ হইল। অতি নির্ভীক পাদবিক্ষেপে, সেই লোক-সমুদ্র-মধ্যে, অবগুণ্ঠনবতী অগ্রসর হইতে লাগিল. সে যথাস্থানে উপস্থিত হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আইন অনুসারে এখনই তোমার ফাঁসি হইবে তাহা তুমি জান। এখন তুমি কিছু বলিতে চাহ কি ?"

কনষ্টবলগণ চারিদিকের কোলাহল নিবারণের জন্য চুপ চুপ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। সমাগত লোক সকল রুদ্ধনিশ্বাসে হত্যাকারিণী কালীর উত্তর

শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। তখন কামী অতি মধুর কোমল ও ভীতিশূন্য স্বরে উত্তর দিল,—

"আমার অঙ্গে করস্পর্শ না হয় এইরূপ ভাবে একবার আমার মুখের কাপড় খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করুন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীর বাসনানুযায়ী আদেশ করিলে, একজন কনষ্টবল সাবধানতা সহকারে, তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। কিন্তু একি! সাক্ষাৎ স্বর্গকন্যা! ম্যাজিষ্ট্রেট সেই কামিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইলেন। রমণী সুন্দরীর শিরোমণি। সুন্দরী ধীরে ধীরে চারিদিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার নিষ্পাপ বদন-শ্রী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও অপার্থিব সৌকুমার্য্য দেখিয়া দর্শকগণ অবাক্ হইল। সেই সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বলতায় সেই ঘৃণিত বধ্যভূমিও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সকলেই ঘোর বিস্ময়াকুল! তখন জজ সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাণে কাণে বলিলেন,

"একি এ? আমি যে আসামীর উপর ফাঁসির হুকুম দিয়াছি, এ কখনই সে নহে!"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—

"তাইত, আমি যে আসামীকে দায়রা সোপরদ্দ করিয়াছি, এ কখনই সে নহে!"

পুলিস সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিলেন,—

"আমি যে আসামীকে দুই তিন দিন হাজতে দেখিয়াছি, এ কখনই সে নহে!"

ইনিস্পেক্টর বলিলেন,—

"আমি যে আসামীর জবানবন্দী লইয়া গ্রেপ্তার করিয়াছি এবং বার বার যাহাকে দেখিয়াছি, এ কখনই সে নহে!"

ম্যাজিষ্ট্রেট নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—

"তাহা হইলে নিশ্চয়ই একটা বিষম ব্যাপার ঘটিয়াছে। এখন উপায়?"

জজ সাহেব বলিলেন,—

"আপাততঃ ফাঁসি বন্ধ রাখিয়া, তদারক করা আবশ্যক।"

তখন সুন্দরী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমি এখন ফাঁসিকাঠে উঠিব কি?"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন,—

"না, তোমাকে ফাঁসিতে উঠিতে হইবে না। তুমি যে এ মোকদ্দমার আসামী কালী নহ তাহা স্থির। কালী কোথায় এবং তাহার কি হইয়াছে, তাহা তুমি অবশ্যই জান। তুমি কালীকে বাঁচাইবার জন্য যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে আইনের চক্ষে, তোমার অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ ঘটিয়াছে। এখনই তোমার অপরাধের যথাবিহিত তদারক হইবে। তাহার পর তোমার বিচার হইয়া শাস্তি হইবে। আপাততঃ কনষ্টবলেরা, তুমি যেখানে ছিলে, সেই থানেই তোমাকে রাখিয়া আসুক।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এইরূপ আদেশ দিলে, কনষ্টবলগণ আবার সেই সুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া জেলে ফিরিল, তাহার সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, পুলিস সাহেব এবং ইনিস্পেক্টর বাবুও চলিলেন।

ফাঁসি বন্ধ হইয়া গেল। যাহারা বড় সাধ করিয়া ফাঁসি দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা বড় দুঃখিত হইয়া বাড়ী ফিরিল। বাটী ফিরিবার সময় লোকে নানারূপ জল্পনা করিতে লাগিল। কেহ বলিল,—'কালী অনেক তন্ত্র মন্ত্র জানিত। সে মন্ত্রের জোরে চেহারা বদলাইয়া, ফাঁসি হইতে বাঁচিয়া গেল।' কেহ মহাবিজ্ঞের মত বলিল,—"আরে নাহে না. তাকে ফাঁসি দেওয়া ইংরেজ কোম্পানির ক্ষমতা নয়। দেখিলে, এক নজরায় সকলের মুণ্ডু ঘুরাইয়া দিল।" আর একজন বলিল,—'এ সকলই দেবতার কৃপা। দেবতা নহিলে এমন করিয়া বাঁচাইতে পারে কে? দেখিলে না মেয়েটার চেহারা? মানুষের কি কখন এমন চেহারা হয়?' কেহ বলিল—'দাদা, ঐ যে পুলিস, ওদের পায়ে নমস্কার। এ সকলই জানিবে পুলিসের খেলা। পুলিস টাকা খাইয়া এই বিভ্রাট বাধাইয়াছে। তাহা না হইলে যেখানে মাছিটি পর্য্যন্তও যাইবার যো নাই, সেই জেলখানার ভিতরে এমন কাণ্ড ঘটায় কে?' মীমাংসা নানারূপ।

# একাদশ পরিচ্ছেদ।

যে দিন কালীর ফাঁসি হইবার কথা, তাহার চারিদিন পূর্ব্ব হইতে, একটা গুরুতর বৈষয়িক মোকদ্দমা উপলক্ষে, রমাপতি বাবু কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। চৌরঙ্গিতে তাঁহাদের এক প্রকাণ্ড বাড়ী আছে; তিনি বহু লোকজন সঙ্গে লইয়া সেই বাটীতে বাস করিতেছেন। আলিপুর ও কলিকাতার উচ্চপদস্থ বিস্তর সাহেব ও বড় লোকের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। বিশেষতঃ আলিপুরের তখনকার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল। কালীর ফাঁসি হইবার দিন, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রমাপতি বাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রমাপতি তাঁহাকে বিশিষ্ট সমাদর-সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া স্বাস্থ্যাদি বিষয়ক শিষ্টাচার সূচক জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, সমুচিত শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া, যে উদ্দেশে তিনি আসিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন —

"আপনার দেশের কালীর ফাঁসি উপলক্ষে যে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা আপনি শুনিয়াছেন বোধ হয়।"

রমাপতি বাবু সে সকল ব্যাপারের কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। তিনি সাহেবকে সেইরূপ বলিলে, সাহেব সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া, রমাপতি বাবু নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং সেই স্ত্রীলোককে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতূহল প্রকাশ করিলেন। মাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—

"আমি তাহাই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি; এই অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব, তদারকের কোন ক্রটি করা হয় নাই। আমি স্বয়ং এবং পুলিস নিয়ত ইহার তদন্তে নিযুক্ত রহিয়াছি, কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার বোধ হয়, আপনার দেশের কোন লোক ইহাতে লিপ্ত আছে; এজন্য আপনি একবার দেখিলে হয় ত সহজেই সকল কথা বাহির হইয়া পড়িবে; নিতান্ত পক্ষে তদন্তের সুবিধা জনক অনেক কথা ব্যক্ত হইবে বলিয়া আমার ভরসা আছে।"

রমাপতি বলিলেন,—

"বেশ কথা। একবার কেন, আবশ্যক হইলে, আমি বহুবার তথায় যাইতে প্রস্তুত আছি। আমি জেলখানায় যাইলে যাহাতে সেই স্ত্রীলোকের কামরায় যাইতে পারি এবং তাহার সহিত আবশ্যক মত কথাবার্ত্তা কহিতে পারি, আপনি দয়া করিয়া জেলর সাহেবকে

তাহার বিহিত উপদেশ দিবেন। আমি কল্য প্রাতেই সেখানে যাইব।”

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—

“আপনি এ জেলার একজন অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট, এবং সর্ব্ববিধ রাজকীয় অনুষ্ঠানের ও সাধারণ-হিতকর কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী, সুতরাং আবশ্যক ও ইচ্ছা হইলে, জেল পরিদর্শন করিতে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তথাপি এ সম্বন্ধে অদ্য রাত্রেই জেলরকে এক বিশেষ পত্রদ্বারা আমি উপদেশ প্রদান করিব। তা ছাড়া আপনি আমার এই কার্ডখানি রাখিয়া দিউন। ইহার পৃষ্ঠে আমি স্বতন্ত্ররূপ আদেশ লিখিয়া দিতেছি। ইহা আপনার নিকটেই থাকিবে। আবশ্যক হইলে, এই কার্ড হাতে দিয়া, আপনি অপর কোন ব্যক্তিকেও সেখানে পাঠাইতে পারিবেন।”

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পেন্‌সিল দ্বারা কার্ড পৃষ্ঠে স্বীয় আদেশ লিখিয়া তাহা রমাপতি বাবুর হস্তে প্রদান করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—

“আপনার অনুসন্ধানের ফল জানিবার নিমিত্ত আমি উৎসুক থাকিব। হয়ত কালি প্রাতে আমিও জেলখানায় যাইতে পারি।”

রমাপতি বাবু বলিলেন,—

“আপনার যাওয়া হয় ত ভালই; না হইলে আমি

জেলখানা হইতে ফিরিবার সময় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব।"

তাহার পর মাজিষ্ট্রেট সাহেব, বিহিত বিধানে বিদায় গ্রহণ করিয়া, প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতে বেলা আটটার সময়, রমাপতির অশ্বদ্বয় বাহিত ব্রুহাম আসিয়া জেলখানার দ্বারে উপস্থিত হইল। তিনি গাড়ি হইতে নামিবার পূর্ব্বেই জেলর সাহেব, ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহার সমীপস্থ হইলেন এবং বিশেষ সম্মান সহকারে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। রমাপতি বাবু পকেট হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রদত্ত কার্ডখানি বাহির করিয়া, জেলরের হস্তে দিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিয়া উঠিলেন,

"থাকিতে দিন—উহা আপনার নিকটেই থাকিতে দিন। যদি মহাশয় অন্য কোন লোক পাঠান, তাহা হইলে তাহার হস্তে ঐ কার্ডখানি থাকা আবশ্যক হইবে। এ সম্বন্ধে কল্য রাত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পত্রদ্বারা আমাকে তাঁহার আদেশ জানাইয়াছেন। এক্ষণে আমি মহাশয়ের আজ্ঞার অধীন। আপনি একাকী, কি অপর লোক সঙ্গে লইয়া, আসামীর ঘরে যাইবেন আজ্ঞা করুন।"

রমাপতি বাবু বলিলেন,—

"আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে, আমার

অনেক কথা জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি প্রথমে আমাকে বলুন, সে স্ত্রীলোক সারাদিন কি করে।"

জেলর বলিলেন,—

"তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কারণ সে যেরূপ লজ্জাশীলা ও কোমল স্বভাবা, তাহাতে তাহাকে কোন ভাল ঘরের মেয়ে বলিয়াই আমার বোধ হইয়াছে; এজন্য সারাদিন তাহার ঘরে উঁকি দিয়া দেখা আমার নিষেধ আছে। বোধ হয় সে সারাদিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।"

রমাপতি বলিলেন,—

"ভাল, তুই চারিদিনের মধ্যে জেলখানার নিকটে কোন নূতন লোক দেখা গিয়াছে কি?"

জেলর একটু চিন্তার পর বলিলেন,—

"আজি চারি পাঁচ দিন হইতে একজন সন্ন্যাসী জেলখানার বাহিরে বটগাছ তলায় বাসা করিয়া আছে দেখিতেছি। আর কোন বিশেষ লোক আমরা লক্ষ্য করি নাই।"

রমাপতি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"সন্ন্যাসী এ কয়দিন এখানে বাসা করিয়া আছে, আপনি তাহার সহিত কোন দিন কোন কথা কহিয়াছেন কি?"

জেলর বলিলেন,—

"না। আমি তাহার সহিত এ কয় দিন কোন কথা কহিবার আবশ্যকতা অনুভব করি নাই; অদ্যও কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। কারণ সে ব্যক্তির সহিত এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

রমাপতি বলিলেন,—

"তাহাতো আমিও বুঝিতেছি; তথাপি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে সন্ন্যাসী এতদিন কোথায় থাকিত, তাহা আপনি জানেন কি?"

জেলর বলিলেন,—

"আমি রামদীন নামে পাহারাওয়ালার নিকটে তাহার অনেক সন্ধান লইয়াছি। শুনিয়াছি সে সন্ন্যাসী নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়; সে কোন স্থানে স্থির হইয়া থাকে না। হয় তো সে আবার আজিই এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারে।"

রমাপতি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"তাহা যায় যাউক; কিন্তু এত দেশ থাকিতে, সে এই জেলখানার নিকটেই আড্ডা গাড়িয়া বসিল কেন, তাহার কোন সন্ধান আপনি বলিতে পারেন?"

তাহা ঠিক জানি না। বোধ হয় এ স্থানটা, অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন বলিয়া, সে এখানেই বাসা করিয়াছে।"

"সে সারাদিন কি করে জানেন কি?"

"সারাদিন তাহার কাছে বিস্তর লোক থাকে দেখি,

শুনিয়াছি সে অনেক আশ্চর্য্য ঔষধ জানে; সে লোকদের দেয়।”

“তাহাই যদি তাহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে লোকালয়ের আরও নিকটে তাহার থাকা উচিত ছিল। এরূপ এক প্রান্তে থাকিয়া ঔষধ বিতরণ বিশেষ সুবিধাজনক বোধ হয় না। সে যাহা হউক, আসামী কালী যখন জেলে ছিল, তখন কেহ কোন দিন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল কি?”

“হাঁ, একদিন তাহার খুড়া একা, আর এক দিন সে তাহার এক কন্যাকে সঙ্গে লইয়া, কালীকে দেখিতে আসিয়াছিল।”

আবার রমাপতি বাবু জিজ্ঞাসিলেন,—

“সেই খুড়া ও তাহার কন্যা যখন কালীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি?”

“আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলাম।”

“সেই কন্যা ঘোমটা দিয়া আসিয়াছিল, কি তাহার মুখ খোলা ছিল?”

“ঘোমটা দেওয়াই ছিল।”

“আপনি একবারও তাহার মুখ দেখিতে পান নাই?”

“না, বরাবরই তাহার মুখ ঢাকা ছিল।”

“তবে সে কি জন্য দেখা করিতে আসিয়াছিল? সে

যদি একবারও মুখ না খুলিল তবে তাহার আসিবার কি দরকার ছিল? সে কথা যাউক, কালী কি সারাদিন মুখ ঢাকিয়া থাকিত, না মুখ খুলিয়া থাকিত?"

"প্রায়ই মুখ ঢাকিয়া থাকিত।"

"ফাঁসির কয়দিন পূর্ব্বে খুড়া ও তাহার কন্যা কালীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল?"

"আগের দিন।"

"ঠিক কথা!"

"তাহারা কখন্ আসিয়াছিল?"

"সন্ধ্যার একটু আগে।"

"ঠিক ঠিক!"

"কেন, আপনি ইহা হইতে কি মীমাংসা করিতেছেন?"

"কেন আপনি কি দেখিতেছেন না, আপনাদের চক্ষের উপরেই মানুষ বদল হইয়াছে? তাহা হউক। কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে স্ত্রীলোক কালীর বদলে এখন জেলে আছে, সে যদিই কালীর আপনার খুড়তুতো ভগ্নী হয়, তাহা হইলেও একজনের জন্য, ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণ দিতে যাওয়া সোজা কথা নয়। অতএব হয় সে দেবতা, না হয় পাগল।"

জেলর বলিলেন—

"এরূপ ঘটনা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আপনি

সেরূপ ভাবে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা সেরূপ সম্ভাবনা একবারও মনে করি নাই। হয় ত আপনিই কৃতকার্য্য হইবেন।”

রমাপতি বাবু বলিলেন,—

“আপনি বিশেষ সাবধান হইয়া জেলখানার বাহিরের গাছতলায় যে সন্ন্যাসী বাসা করিয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই এ কাণ্ডের মধ্যে লিপ্ত আছে। সাবধান, সে যেন পলাইতে না পারে।”

“বলেন কি? সে নেংটা সন্ন্যাসীর সহিত এ কাণ্ডের কোনই সম্পর্ক থাকা সম্ভব বলিয়া আমার তো বোধ হয় না।”

“কোন সম্পর্ক থাকা সম্ভব কি না, তাহা আপনি পরে বুঝিতে পারিবেন। আপাততঃ আমি স্বয়ং আসামীর ঘরের চাবি খুলিয়া একাকী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিব। আর কেহ আমার সঙ্গে যাইবার বা থাকিবার দরকার নাই। আপনি আমাকে নিঃশব্দে দূর হইতে সেই ঘরটি দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব।”

রমাপতি গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া জেলরের সঙ্গে সঙ্গে জেলখানায় প্রবেশ করিলেন। সেই পাপীর নিকেতন, অধম ও পতিতগণের বাসভূমি এবং দণ্ডবিধির লীলাক্ষেত্রের মধ্যে, রমাপতি, কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, চলিতে লাগিলেন। নারীবিভাগে উপনীত

হওয়ার পর, জেলর সাহেব, রমাপতি বাবুর হস্তে একটি চাবি দিয়া, দূর হইতে একটি প্রকোষ্ঠ দেখাইয়া দিলেন। রমাপতি, ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠসমীপস্থ হইয়া, ধীরে ধীরে সেই চাবি খুলিলেন। ধীরে ধীরে সেই প্রকাণ্ড কবাট খুলিয়া গেল। তখন রমাপতি দেখিলেন—অপূর্ব্ব দর্শন!

দেখিলেন, সেই দ্বারের দিকে সম্মুখ করিয়া, আগুল্‌ফ-লম্বিত-জটা-ভার-সমন্বিতা, বিভূতি-বিলেপিত-কায়া, আয়ত-প্রদীপ্ত-লোচন-শালীনী, শান্তি-সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্য-জ্যোতির্ম্ময়ী, ত্রিশূল-ধারিণী এক ভুবনমোহিনী ভৈরবী! কোথায় কালী? কোথায় ম্যাজিষ্ট্রেটবর্ণিত সেই সুন্দরী? রমাপতিকে সম্মুখে দেখিবামাত্র ভৈরবী চমকিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার বদন হইতে একটি অপরিস্ফুট মৃদুধ্বনি বাহির হইয়া পড়িল।

সেই সুকুমার-কায়া সুন্দরী সন্ন্যাসিনা সন্দর্শনে রমাপতিও নিতান্ত বিচলিত-চিত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু কি করিতে সেখানে আসিয়াছেন, তাহা তিনি ভুলিয়া গেলেন। কে এ নবীনা সন্ন্যাসিনী? রমাপতির মনে হইতে লাগিল হয় তো, কোথায় যেন তিনি এই ভৈরবীকে দেখিয়াছেন। যেন এই জটাজূটাধারিণী সন্ন্যাসিনীর সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই আলাপ ছিল। যেন এই বিভূতি-

সমাবৃত-বদনা সন্ন্যাসিনীর মুখ-মণ্ডল তাঁহার চিরপরিচিত। কিন্তু কে এ নবীনা সন্ন্যাসিনী? এরূপ ভৈরবীর সহিত পূর্ব্বপরিচয় নিতান্ত অসম্ভব বোধে রমাপতি, ধীরে ধীরে আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধিকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া অতি সঙ্কোচ সহকারে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আপনি—আপনি—কালীকে জানেন কি?"

সংক্ষুব্ধস্বরে সন্ন্যাসিনী উত্তর দিলেন,—

"তাঁহার নাম শুনিয়াছি, কিন্তু আলাপ নাই।"

কিন্তু তাঁহার উত্তরের মর্ম্ম তখন কে প্রণিধান করিবে? তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর রমাপতিকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এ কি কণ্ঠস্বর! এইরূপ স্বর—প্রায় এইরূপ কোমল বিণা-ধ্বনিবৎ মধুর স্বর, রমাপতির প্রাণের নিভৃত কোণে এখনও থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া থাকে। তবে কে এ সন্ন্যাসিনী? আবার রমাপতি নিজের উপর প্রভুতা হারাইয়া, কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন। আবার কিয়ৎকাল পরে সযত্নে চিত্তকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া, তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"আপনি কি আমাকে কখন দেখিয়াছেন?"

যুবতী কথার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রমাপতির ব্যাকুল চিত্ত নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল। তখন তিনি উন্মত্তবৎ নিতান্ত অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কিন্তু বল তুমি, ভৈরবীই হও আর যেই হও, বল, বল, তুমি আমার কে ?"

রমাপতি প্রশ্নের কোন উত্তর পাইলেন না, কিন্তু তিনি দেখিলেন, লোচন-প্রবাহিত জলে সেই সন্ন্যাসিনীর সুগোল গৌর গণ্ডের বিভূতি বিধৌত হইতেছে। তখন তাঁহার প্রাণ মাতিয়া উঠিল। তখন নিতান্ত উন্মাদের ন্যায় উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া, 'সুকুমারী, সুকুমারী' শব্দে চীৎকার করিতে করিতে, তিনি সেই সন্ন্যাসিনীকে আলিঙ্গন করিবার অভিপ্রায়ে, প্রধাবিত হইলেন। তখন সেই নবীনা কয়েক পদ পশ্চাতে সরিয়া আসিয়া, সহসা ছিন্নমূল তরুর ন্যায়, ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন এবং উভয় হস্তে রমাপতির চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া, রোদন বিজড়িত স্বরে বলিতে লাগিলেন,

"আপনি আমার দেবতা, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ গুরু। আমি আপনার দাসীর দাসী! কিন্তু প্রেমাবতার প্রভো! আমার এ দেহে এখন আর আমার বা আপনার কোনই অধিকার নাই। অতএব আমাকে আর স্পর্শ করিবেন না।"

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর কালে, রমাপতি বাবুর ব্রুহাম সবেগে আসিয়া তাঁহার চৌরঙ্গিস্থ ভবনের গাড়ি বারান্দায় উপনীত হইতে না হইতে, তিনি বালকের ন্যায় অস্থির ভাবে শকট হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন, এবং দৌড়িতে দৌড়িতে পুরমধ্যে সুরবালার সমীপস্থ হইয়া, ব্যস্ততা সহ বলিলেন,—

"সুরবালা, সুরবালা! যাহা হইবার নহে তাহাও হইয়াছে। এত দিনে সুকুমারীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। এবার স্বপ্ন বলিতে পারিবে না; ঘুমের ঘোর বলিতে পারিবে না। সুকুমারী এবার সশরীরে দেখা দিয়াছেন।"

সুরবালা সবিস্ময়ে বলিলেন,—

"এবার বুঝি তুমি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছ; নয় তো তোমার মাথার ঠিক নাই।"

রমাপতি বলিলেন,

'না না সুরবালা, আমি দিব্যজ্ঞানে, সম্পূর্ণরূপ জাগ্রত থাকিয়া, তোমার সহিত কথা কহিতেছি। অসম্ভব হইলেও, আমার কথা মিথ্যা নহে। আমি এখনই সুকুমারীকে দেখিয়া, তাঁহার সহিত কথা কহিয়া আসিতেছি।"

এই বলিয়া রমাপতি বাবু, কালীর ফাঁসির উপলক্ষে এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্তই সুরবালাকে জানাইলেন। তাহার পর পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন,—

"এই দেখ সুরবালা, আমার হাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরোয়ানা। আমি সুকুমারীকে কয়েদ হইতে খালাস করিবার জন্য, জামিননামায় নাম সহি করিয়াছি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই পরোয়ানা দিয়াছেন; ইহা দেখাইলেই জেলর সাহেব সুকুমারীকে ছাড়িয়া দিবেন। আমি, এই পরোয়ানা লইয়া, জেলখানা হইতে, সুকুমারীকে আনিতে যাইতেছি। তুমি আর এক ঘণ্টা অপেক্ষা কর; এখনই সুকুমারীকে তোমার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিব।"

"বল কি? এবার যেন তোমার কথা অনেকটা সত্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। এরূপ সম্ভাবনার অতীত শুভ দৃষ্ট যখন ঘটিয়াছে, তখন দয়াময়! তোমার এই দাসী তোমার চরণে একটি ভিক্ষা না চাহিয়া থাকিতে পারিতেছে না; তুমি তাহাকে তাহা দিবে না কি? এমন শুভদিনে যাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করিলে, কর্ম্মের গৌরব হইবে কিসে?"

তখন রমাপতি সাদরে সুরবালার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—

"পাগলিনি! তোমাকে দেওয়া হয় নাই, এমন

বস্তু আমার আর কি আছে? এখন বল, কি তোমার হুকুম।"

সুরবালা বলিলেন,—

"রাগ করিও না—দিদিকে আনিবার জন্য আমি নিজে জেলখানায় যাইব। সেই অতি কদর্য্য স্থানে আমাকে যাইতে হইলে, কাজেই বহুলোকের সমক্ষে পড়িতে হইবে। কিন্তু যাহাই কেন হউক না, আমি সেই জেলখানায় না গিয়া ছাড়িব না। যখন সেই পুণ্যবতীর পদরজ সেইখানে পতিত হইয়াছে, তখন সে স্থানের আর অপবিত্রতা নাই। আর লোকের চক্ষে পড়িলে যদি কোন ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি লোকেরই হইবে, আমার তাহাতে কি? তবে কেন আমাকে যাইতে দিবে না?"

রমাপতি বলিলেন,—

"কে বলিয়াছে, তোমায় যাইতে দিব না? কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি যখন আর এক ঘণ্টার মধ্যেই ঘরে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তখন নানা অসুবিধার মধ্যে, সেখানে তোমার নিজে যাওয়ার প্রয়োজন কি?"

সুরবালা বলিলেন,—

"প্রয়োজন যে কি, তাহা কেবল আমার প্রাণ জানে, আমি তাহা বলিয়া বুঝাইতে অক্ষম। রাজভক্তি কি তাহা জান তো? রাজার সহিত প্রজার কোন জাতিত্ব, কুটুম্বিতা থাকে কি? তাহা থাকে না। তথাপি সেই প্রজারা,

আবশ্যক হইলে, রাজার জন্য অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত দেয় কেন? কেবল ভক্তিই তাহার কারণ। যে দেবী এখন কারাগারে, তিনি আমার কে? লোকে বলিবে তিনি আমার কোন আপনার লোক হওয়া দূরে থাকুক, বরং আমার শত্রু। কিন্তু এ সকল লোকের কথা, আমার প্রাণ আমাকে অন্যরূপ উপদেশ দিয়াছে। আমার প্রাণ জানে ও বুঝে তিনি আমার রাজার রাজা। যিনি আমার রাজা, এ দাসীর জীবন মরণ যাঁহার ইচ্ছার অধীন, যাঁহার চরণে এ প্রাণ দিবারাত্রি লুঠিয়া বেড়ায়, তাঁহার হৃদয়রাজ্যে যাঁহার রাজত্ব, আমার সেই রাজার রাজা, সুদীর্ঘ বনবাসের পর, আবার তাঁহার রাজ্যে ফিরিয়া আসিবেন। তবে বল দেবতা, এমন শুভদিনে আমি রাজরাজেশ্বরীকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া না আনিয়া থাকিতে পারি কি? অতএব আমি আজি এ বিষয়ে কোন আপত্তি শুনিব না। তুমি কোচম্যানকে আর একখানি গাড়ি জুতিতে বল, আমি আবশ্যকমত লোকজন সঙ্গে লইয়া শীঘ্রই বাহিরে যাইতেছি। দেখিও এক তিলও বিলম্ব হয় না যেন।”

সুরবালা, আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিলেন। তখন রমাপতি সেইস্থানে দাঁড়াইয়া, বহুদিন যাহা বার বার ভাবিয়াছিলেন, আজি আর একবার তাহাই ভাবিলেন।—‘সুরবালা দেবী, না মানবী?’

সুরবালার বাসনানুযায়ী আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত হইলে তিনি, মাধুরী ও খোকা বাবুকে সঙ্গে লইয়া, রমাপতি বাবুর সহিত, ব্রুহামে উঠিলেন। দুইজন ঝি ও কয়েক জন দ্বারবান্ স্বতন্ত্র গাড়িতে উঠিল। তখন রমাপতি বলিলেন,—

"মাধুরী ও খোকাকে রাখিয়া গেলে হইত না?"

সুরবালা বলিলেন,—

"কাহার জিনিষ আমি রাখিয়া যাইব? উহারা তাঁহারই। যদি তাঁহাকে ঘরে আনিতে পারা যায় তোমার আমার যত্নে তাহা হইবে না। ভগবানের কৃপায় যদি আমার মনের সাধ পূর্ণ হয়, সে জানিবে মাধু ও খোকার দ্বারাই হইবে।"

সুরবালা আজি নিরলঙ্কৃতা। তাঁহার পরিধান এক থানি সামান্য বস্ত্র এবং অঙ্গ ভূষণবর্জ্জিত। কেবল বাম হস্তে, সধবা নারীর সকল ভূষণের সার ভূষণ, এক 'নোয়া' শোভা পাইতেছে। রমাপতির হৃদয়ে আজি দুর্ব্বিসহ ঝড় বহিতেছে; যাহা কখন মানব অদৃষ্টে ঘটে নাই, তাহাই তাঁহার আজি ঘটিতেছে; তাঁহার ভাগ্যগুণে মরা মানুষ আজি আবার দেখা দিয়াছে; তাই রমাপতি আজি উন্মাদ। তাই তিনি এতক্ষণ সুরবালার বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে সহসা সেই মণিমাণিক্যালঙ্কার-বিভূষিতকায়ার এই বেশ দেখিয়া বলিলেন,—

"এ কি সুরবালা, তোমার আজি এ ভিখারিণীর ন্যায় সাজ কেন?"

সুরবালা বলিলেন,—

'আমি যাঁহার দাসী, তিনি আজি ভিখারিণী। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার না পরাইলে, তাঁহার দাসীর দেহে অলঙ্কার সাজিবে কেন?"

"সুকুমারি! আমি হীন ও অধম বলিয়া যদি আমার প্রতি তোমার কৃপা না হয়, কিন্তু এই সুরবালার মায়া তুমি কেমন করিয়া কাটাইবে?"

গাড়ি ত্বরিত চলিয়া জেলখানার দ্বারে উপনীত হইলে, রমাপতি বাবু তাহা হইতে সত্বর নামিয়া পড়িলেন। জেলর সাহেব তৎক্ষণাৎ সমীপাগত হইলে, রমাপতি বাবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রদত্ত পরোয়ানা তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন,—

"পাঠ করুন।"

জেলর সাহেব আজ্ঞা পাঠ করিয়া বলিলেন,—

"এজন্য আপনার এত কষ্ট করিয়া না আসিলেও চলিত। এই পরোয়ানা পাঠাইয়া দিলেই, আমি স্বয়ং অথবা উপযুক্ত লোক সঙ্গে দিয়া, আসামীকে আজ্ঞামত স্থানে পাঠাইয়া দিতাম।"

"তাহা আমি জানি; তথাপি যে কেন আসিয়াছি তাহা আপনি ক্রমশঃ জানিতে পারিবেন। আমি একা

আসি নাই। এই গাড়িতে আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাও আছেন। তাঁহারা সকলেই আসামীকে জেলখানা হইতে মুক্ত করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিতে চাহেন। অন্য কোন লোক জন সেদিকে না থাকে। আমার স্ত্রী, দুইজন দাসী আমি স্বয়ং আর আপনি থাকিলেই হইবে।”

জেলর বলিলেন,—

“যদি বলেন, তাহা হইলে আমিও সঙ্গে না থাকিতে পারি।”

রমাপতি বাবু বলিলেন,—

“আপনি সঙ্গে থাকায়, আমার বা আমার স্ত্রীর কোন আপত্তি নাই। আপনি এ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা বিশেষ আবশ্যক।”

জেলর বলিলেন,—

“তাহাই হউক। আমি সেদিক হইতে অন্য লোক জন সরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসি।”

তিনি, একজন ওয়ার্ডরকে ডাকিয়া শীঘ্র নির্দ্দিষ্ট কামরার চাবি আনিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন এবং এক-জন কনষ্টবলকে ডাকিয়া সেদিকে যাহাতে কোন লোক না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলেন। উভয়েই সাহেবকে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। কনষ্টবল তখনই ফিরিয়া আসিয়া আজ্ঞামত ব্যবস্থা করা হইয়াছে জানাইয়া গেল। কিন্তু ওয়ার্ডার এখনও ফিরিল

না। রমাপতি নিতান্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করায়, জেলর সাহেব স্বয়ং চাবির জন্য ধাবিত হইলেন, কিন্তু অবিলম্বে বিমর্ষবদনে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—

"সর্ব্বনাশ হইয়াছে! চাবির ঘরে হুকে ঝুলান, সারি সারি চাবি রহিয়াছে, কিন্তু ঐ নম্বরের চাবিটি নাই!"

রমাপতি বাবু চমকিয়া বলিলেন,—

"বলেন কি? চাবি নাই? কি হইল? নিশ্চয়ই ওয়ার্ডার কোন ভুল করিয়াছে—নিশ্চয়ই আর কোথায় চাবি রাখিয়াছে।"

জেলর বলিলেন,—

"এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক; কারণ ওয়ার্ডার পঁচিশ বৎসর এই কর্ম্ম করিতেছে, কখন তাহার কোন ভুল দেখা যায় নাই!"

রমাপতি বলিলেন—

"কখন কোন ভুল হয় নাই বলিয়া, কখন যে কোন ভুল হইবে না তাহা স্থির নহে। আপনি আবার দেখুন।"

জেলর আবার গমন করিলেন এবং ত্বরায় ফিরিয়া আসিয়া, নিতান্ত হতাশ ভাবে বলিলেন,—

"কোন আশা নাই—নিশ্চয়ই চাবি চুরি গিয়াছে। চাবি চুরি যাউক, কিন্তু খবর পাইলাম সে ঘর এখনও খোলা হয় নাই। দরজা এখনও চাবি বন্ধই রহিয়াছে।

অতএব চাবি ভাঙ্গিয়া আসামীকে এখনই বাহির করা যাইতে পারে।”

“তাহাই হউক। জেলখানার যে মিস্ত্রী আছে, তাহাকে শীঘ্র ডাকিয়া লউন, সেও সঙ্গে থাকুক।”

সাহেব, শীঘ্র মিস্ত্রীকে তালা ভাঙ্গিবার যন্ত্র লইয়া আসিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন রামপতির মুখের ভাব উন্মাদের ন্যায়। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—

“সে সন্ন্যাসীর সংবাদ কি?”

“তাহার আর কি সংবাদ? সে বোধ হয় সেই গাছতলাতেই পড়িয়া আছে।”

“বোধ হয় বলিলে চলিবে না, আপনি শীঘ্র তাহার সংবাদ আনিতে লোক পাঠান।”

জেলর সাহেব একজন কনষ্টবলকে সন্ন্যাসীর সংবাদ আনিতে বলিলে, সে বলিল,—

“এখনই আমি বাহির হইতে আসিতেছি, দেখিলাম সে গাছতলা ফাঁক; সেখানে সন্ন্যাসীও নাই, লোকজনও কেহ নাই। সন্ন্যাসী কখন চলিয়া গিয়াছেন কেহ জানে না; বোধ হয় বেলা ১টা হইতে তিনি অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। তিনি যে ফিরিয়া আসিবেন এমন বোধ হয় না। কারণ তিনি তাঁহার হাঁড়ি-কুড়ি ও উনান ভাঙ্গিয়া গিয়াছেন।”

এদিকে দরজা ভাঙ্গিবার জন্য মিস্ত্রি আসিয়াছে দেখিয়া, সাহেব বলিলেন,—

"মহাশয়, মিস্ত্রী উপস্থিত। চলুন তবে।"

রামপতি বাবু হতাশভাবে বলিলেন,—

"চলুন; কিন্তু দরজাই ভাঙ্গুন, আর যাই করুন, দেখিবেন ঘরে আসামী নাই।"

"সেকি মহাশয়! তাহা কি কখন হইতে পারে? আপনি সন্ন্যাসীকে এ সঙ্গে জড়াইতেছেন কেন? সন্ন্যাসীই হউক, ভোজবিদ্যাশালীই হউক, আর দেবতাই হউক, দিনমানে দ্বিপ্রহর কালে, চারিদিকে প্রহরীবেষ্টিত, এই জেলের মাঝখান হইতে আসামী লইয়া যাওয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব। এ ও কি কথা! আপনি আসুন।"

রামপতি বাবু দীর্ঘনিশ্বাস সহ বলিলেন,—

"চলুন।"

তিনি সুরবালার হাত ধরিয়া গাড়ি হইতে নামাইলেন, ঝিরা মাধুরী ও খোকাকে কোলে লইল। প্রথমে মিস্ত্রী তাহার পশ্চাতে জেলর সাহেব, তাঁহার পশ্চাতে রমাপতি ও সুরবালা, তৎপশ্চাতে ঝিরা এবং সর্ব্বশেষে দুইজন দ্বারবান সারি বাধিয়া জেলখানায় প্রবেশ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠের নিকটস্থ হইয়া জেলর সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"দেখুন দেখি, ঘর যেমন তেমনই বন্ধ রহিয়াছে, ইহার মধ্য হইতে আসামী পলাইবে কোথায়? বাবু আপনাদের দেশে পূর্ব্বে যেরূপ মন্ত্র তন্ত্র চলিত, এখন

আর তাহা চলে না। আসামী তো মানুষ—এখান হইতে বাহির হওয়া দেবতারও সাধ্য নহে।”

রামপতি সে কথায় কর্ণপাতও না করিয়া বলিলেন,—

“আপনাদের আসামী আর এ ঘরে নাই। হায়! কি ভুলই হইয়াছে! আমি যদি চলিয়া না যাইতাম! কিন্তু এখন আর উপায় নাই। ভাঙ্গ, মিস্ত্রী দরজা ভাঙ্গ সাহেবকে দেখাও তাঁহার বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। সেই সন্ন্যাসী—কোথায় তিনি? হায়! হায়, আপনি কেন সেখানে পাহারা রাখেন নাই?”

অতি সহজেই মিস্ত্রী চাবি খুলিয়া ফেলিল। সাহেব দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু একি! ঘর যে ফাঁক! তখন তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রামপতি, সুরবালা ও ঝিরাও প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু হায়! যাহার সন্ধানের জন্য সকলের এত উদ্বেগ, সে কোথায়? ঘরে তাহার চিহ্নও নাই! জেলর সাহেব অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন তাঁহার বিপদের সীমা নাই। তিনি স্থির বুঝিলেন, অদ্যই তাঁহার চাকুরীর শেষ দিন। রামপতি তখন সংজ্ঞাশূন্য তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া, মাধুরী সভয়ে ডাকিল,—

“বাবা! বাবা!”

তিনি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

“চল সকলে।”

রামপতি সুরবালার হাত ধরিয়া বেগে গাড়ীতে উঠিলেন। ঝি খোকাকে কোলে দিতে গেলে, রমাপতি তাহাকে 'আঃ' বলিয়া তাড়া দিলেন। অবশেষে ঝি খোকাকে সুরবালার কোলে ফেলিয়া দিল। মাধুরীকে আর এক ঝি কোল হইতে নামাইয়া দিলে, একজন দ্বারবান তাহার হাত ধরিয়া সাবধানতার সহিত গাড়িতে উঠাইয়া যত্ন করিতে লাগিল। মাধুরীর গাড়ীতে উঠা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই, রমাপতি বাবু কেন কোচম্যান দেরি করিতেছে বলিয়া এমন কদর্য্য গালি দিলেন যে, তাঁহার মুখ হইতে তেমন কটূক্তি আর কেহ কখন শুনে নাই। সে বলিল,—

"হুজুর, দিদি বাবু এখনও গাড়িতে উঠেন নাই।"

তখন রামপতি বাবু অত্যন্ত বিরক্তির সহিত এমন জোরে মাধুরীর হাত ধরিয়া গাড়িতে টানিয়া লইলেন যে, বোধ হয় তাহার বড়ই আঘাত লাগিল। সে কিন্তু ভাব গতিক দেখিয়া কাঁদিতে সাহস করিল না। জেলর সাহেব বিনীত-ভাবে রমাপতি বাবুকে সেলাম করিয়া বলিলেন,—

"আমি শীঘ্র মহাশয়ের সহিত সাক্ষাত করিব। আমাকে রক্ষা করিবেন। আমার বিপদের সীমা নাই।"

রমাপতি বাবু তাঁহার সম্মানের কোন প্রতিশোধও দিলেন না। তাঁহাতে তখন তিনি নাই।

সুরবালা এতক্ষণ মুখে অঞ্চল চাপিয়া ছিলেন। গাড়ি বেগে চলিতে আরম্ভ হইলে, তিনি মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিলেন। রমাপতি দেখিলেন,—বহু রোদন হেতু সুর-বালার চক্ষু রক্তবর্ণ, নয়নজলে তাঁহার মুখ ভাসিতেছে।

পিতার এই ভাব ও মাতার এই অবস্থা দেখিয়া মাধুরী কিছু না বুঝিয়াও কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া, খোকা বাবু সুর চড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বালক বালিকার ক্রন্দনে পিতা মাতা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন রমাপতি দীর্ঘনিশ্বাসসহ ঊর্দ্ধদিকে হস্ত বিস্তার করিয়া বলিলেন,—

"সুরবালা! ঐ স্বর্গ, ঐ স্বর্গ ভিন্ন আমরা আর কোথাও হয় তো তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব না।"

---

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চৌরঙ্গির সেই প্রকাণ্ড ভবনের একতম বৈঠকখানায় রমাপতি বাবু নিতান্ত কাতরভাবে অধোমুখে এক শয্যায় পড়িয়া আছেন। প্রকোষ্ঠ নানাবিধ সুরম্য ও বহুমূল্য শোভনসামগ্রী সমূহে পূর্ণ। বাহির হইতে একজন ভৃত্য গৃহমধ্যস্থ টানাপাখা ধীরে ধীরে টানিতেছে। নিতান্ত আবশ্যক উপস্থিত না হইলে, কোন লোকজন নিকটে না আইসে, ইহাই রামপতি বাবুর বিশেষ আদেশ ছিল। এজন্য তাঁহার নিকটে তখন একটিও লোক নাই। কিন্তু তাঁহার প্রকোষ্ঠের বাহিরে দুইজন ভৃত্য উৎকর্ণভাবে তাঁহার আজ্ঞার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। আর এক সুন্দরী, পার্শ্বের এক প্রকোষ্ঠে, যবনিকার অন্তরালে রুদ্ধ নিশ্বাসে উপবিষ্টা। সেই সুন্দরী, সুরবালা। কোথায় মাধুরী? কোথায় খোকা বাবু? তাহা সুরবালার মনেও নাই। যে ব্যক্তির সুখের জন্য তাহার জীবন, তাঁহার চরণের নখাগ্র হইতে মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত সকলই তন্ময়। সুতরাং সেই ভাবনা ব্যতীত সে দেহ ও সে মনে অন্য ভাবনার আর স্থান নাই। সুরবালার অঙ্গ আভরণ শূন্য; কেশরাশি অবেণীসম্বন্ধ ও ধূসরিত; পরিচ্ছদ

মলিন ও পারিপাট্য পরিশূন্য; দেহ শীর্ণ ও কাতর; লোচনদ্বয় বিষণ্ণ ও রক্তাভ এবং বদনমণ্ডল অবসন্ন ও শঙ্কাকুল! সুরবালার আহার নাই, নিদ্রা নাই, সাংসারিক কোন বিষয়েই মনঃসংযোগ নাই। যে দেবতার পদাশ্রয় সুরবালার একমাত্র অবলম্বন, তাঁহার চিন্তা ভিন্ন, সুরবালার অন্তরে অন্য কোন চিন্তার অবসর নাই।

সেই নিরাশায় আশা প্রতিষ্ঠা করিয়া হতাশ হওয়ার পর, সেই দিন বিগত অতুল্যনিধি করতলগত হইয়া হস্তভ্রষ্ট হওয়ার পর, সংক্ষেপতঃ সেই দিন কারাগারে সজীব সুকুমারীকে সন্দর্শন করিয়াও তল্লাভে বঞ্চিত হওয়ার পর হইতে, রামপতি নিতান্ত বিকলিত চিত্ত হইয়াছেন। সুকুমারী হারা হইয়া, তিনি যাহা যাহা লইয়া অধুনা সুখ সন্তোষময় সংসার সংগঠন করিয়াছেন, তাহার কোন পদার্থেরই অভাব ঘটে নাই তো। সেই সুন্দরীশিরোমণি পুণ্যময়ী সুরবালা তাঁহার অবিশ্রান্ত সহচরী; সেই প্রেম-পুত্তলি সারল্য-প্রতিমা মাধুরী ও খোকার মধুর কণ্ঠস্বরে তাঁহার গৃহ দ্বার পরিপূরিত; সেই প্রয়োজনাতিরিক্ত দাসদাসী নিয়ত তাঁহার সেবা ও আদেশ পালনে নিযুক্ত; সেই অতুল সম্পত্তিরাশি ও সুখসংসাধক সামগ্রীসমূহ তাঁহার পদানত; তথাপি রমাপতি কাতর ও মর্ম্মাহত। অপ্রাপ্য পদার্থের প্রাপ্তি সম্ভাবনা বড়ই উন্মাদকারী। এবার

রমাপতির হৃদয়ে বড়ই কঠিন আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহার প্রাণ মন নিতান্ত উদাস হইয়াছে, সুখ সন্তোষে তাঁহার আর স্পৃহা নাই, তিনি অনন্যমনে, নিরন্তর হৃদয়গত নবীভূত যাতনার সেবায় নিযুক্ত আছেন। কেহ তাঁহার সম্মুখে আইসে না, কর্ম্মচারিগণ বিষয় কর্ম্মের কোন সংবাদ তাঁহার গোচর করিতে পায় না, কোন বিষয়েই তিনি আদেশ ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন না। প্রেমময়ী সুরবালার কোন সংবাদ লন না; হৃদয়ানন্দ সন্তানের বার্ত্তা তাঁহার মনে নাই; তিনি কদাচিৎ সামান্য মাত্র আহার করেন; নিদ্রা প্রায় তাঁহার নিকটস্থ হয় না; তিনি উন্মাদের ন্যায় বিকলিত-চিত্ত। সুরবালা নিকটে আসিলে তিনি বিরক্ত হন; মাধুরী ও খোকা তাঁহাকে দেখিলে ভয় পায়।

কি করিলে স্বামীর এই দুরন্ত মনস্তাপ নিবারিত হইবে, কি উপায়ে রমাপতি বাবু আবার প্রকৃতিস্থ হইবেন, সুরবালা নিরন্তর সেই চিন্তায় নিমগ্না। এ ব্যাধির যে ঔষধ, এ ঘোর মানসিক অবসাদের যাহা একমাত্র প্রতিষেধক, তাহা তাঁহার অবিজ্ঞাত নাই। কিন্তু সে সুকুমারীকে কোথায় পাওয়া যাইবে? কে সে সন্ধান বলিয়া দিবে? যদি আত্মজীবনের বিনিময়ে, যদি সর্ব্বস্ব সম্প্রদান করিলেও, সুকুমারীকে পুনরায়

পাওয়া যাইতে পারে, সুরবালা এখনই, তাহাতে সম্মত। কিন্তু সে আশা ক্রমেই ক্ষীণ ও ক্ষীণতর হইতেছে। পুলিস সুকুমারীর সন্ধানের জন্য প্রাণপাত করিতেছে, সুরবালাও বহু অর্থ ব্যয়ে ও নানাবিধ উপায়ে সন্ধানের কোন ত্রুটি করেন নাই। কেবল আশাভঙ্গজনিত ক্লেশের বৃদ্ধিই হইতেছে।

কিন্তু কারাগারে রমাপতি বাবু যে ভৈরবীকে দর্শন করিয়াছিলেন, তিনিই যে সুকুমারী এ কথা কে বলিল? তাঁহাকে আর কেহই দেখেন নাই, আর কেহ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, তিনি যে কে তাহা স্থির করিবার, রমাপতি বাবু ভিন্ন, অন্য উপায় নাই। জেল-খানায় কালীর পরিবর্ত্তে অন্য এক স্ত্রীলোক আসিয়াছে, এ কথা অনেকেই জানেন এবং সে স্ত্রীলোককে বহু-লোকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু রমাপতি বাবু কারাগারে যে ভৈরবী দর্শন করিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত আর কেহই জানে না। জেলর, ম্যাজিষ্টেট, ওয়ার্ডার, পাহারা-ওয়ালা, ডাক্তার বা অন্য কেহই জেলখানায় কোন ভৈরবী দেখেন নাই—সকলেই একজন নিরাভরণা গৃহস্থ-সুন্দরী মাত্র দেখিয়াছেন। কেবল রমাপতি বাবুই ভৈরবী দেখিয়াছেন এবং কেবল তিনিই সেই ভৈরবীকে সুকুমারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। হইতে পারে রমাপতি বাবুর সম্পূর্ণ ভ্রম ঘটিয়াছে। হইতে পারে, সেই সুন্দরীর

সহিত কিঞ্চিন্মাত্র আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া, রমাপতি উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহার সবিশেষ বিচার ও আলোচনার শক্তি তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। সুকুমারীর মৃত্যুসম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ নাই। তিনি সন্তরণে অক্ষম ছিলেন। ঘোর ক্লান্ত ও শ্রান্ত অবস্থায়, রমাপতি বাবুর সমক্ষেই তিনি অগাধ জলে নিমজ্জিত হইয়াছেন। সেরূপ অবস্থা হইতে তাঁহার জীবন লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। এ কথা অন্যেও যেমন বুঝেন রমাপতি বাবুও তেমনিই বুঝেন; তবে দৈবাৎ এক ভৈরবী দেখিয়া তিনি সুকুমারীভ্রমে এতাদৃশ উন্মত্ত হইলেন কেন? বিশেষতঃ যদিই সুকুমারী কোন অলৌকিক উপায়ে জীবনলাভ করিয়াছেন স্বীকার করা যায়, তথাপি তিনি এরূপ কাণ্ডের মধ্যে কি প্রকারে লিপ্ত হইয়া, এতাদৃশ অসমসাহসিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, তাহারও কোন সঙ্গত মীমাংসা স্থির করা যায় না। সুকুমারীর পূর্ব্বপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে এরূপ ব্যাপার তাঁহার পক্ষে সর্ব্বথা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার ন্যায় লজ্জাশীলা, কোমলস্বভাবা, সঙ্কুচিতা নারীর পক্ষে এতাদৃশ কঠোর ও লোমহর্ষণ কাণ্ডের নায়িকারূপে অবতীর্ণ হইয়া দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দকে ভয়ে চমকিত এবং বিস্ময়ে পরিপ্লুত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা। যুক্তি ও তর্কের পথানুসরণ করিলে, রমাপতি বাবুর

সুকুমারী সন্দর্শন যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক কথা, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ থাকে না। কিন্তু সে কথা, অন্যে বুঝিলেও তিনি বুঝেন কই? আর তিনি যদি তাহা না বুঝিলেন, তাহা হইলে ফল কি হইল? সেই ভৈরবী যে সুকুমারী তৎপক্ষে রমাপতি বাবুর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ন্যায় ও তর্ক শাস্ত্রের সমস্ত ব্যবস্থাই তাঁহার প্রতিকূলে মস্তক উত্তোলন করিলেও, তিনি কোন্‌দিকে দৃক্‌পাত, বা কিছুতেই কর্ণপাত করিবেন না। অতএব তাঁহাকে বুঝাইবে কে?

এখন উপায় কি? তাহা সুরবালা নিরন্তর চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না। তবে কি ধীরে ধীরে চিন্তাচর্ব্বিত রমাপতির প্রাণান্ত হইবে? এরূপ দুঃসহযন্ত্রণা আর কিছুকাল থাকিলে মানব-প্রাণ অবশ্যই অপগত হইবে। তাহাই কি রমাপতির এ অবস্থার শেষ পরিণাম? যখন যাতনা খর্ব্বীকৃত করিবার কোনই পন্থা নাই, তখন ধীর ভাবে অবশ্যম্ভাবী চরমকালের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করা ভিন্ন আর কি ব্যবস্থা আছে?

সারল্যপ্রতিমা সুরবালা বিরলে বসিয়া সকল কথাই বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়াছেন; তিনি স্থির করিয়াছেন, যখন রমাপতি বাবুর জীবন রক্ষা করিবার অন্য কোন উপায় নাই, তখন অতঃপর আত্ম-

জীবন রাখিবার, আর কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। সেই নিদারুণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনামাত্র স্মরণ ও মনন করিলে যখন হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহার আগমন দর্শন করিবার জন্য অপেক্ষা করিবে কে? সুরবালা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে পারেন কি? আত্ম-হত্যা দ্বারা জীবন বিধ্বংসিত করা ভিন্ন সুরবালার বাসনাসিদ্ধির উপায়ান্তর নাই। তিনি তাহাতেই কৃতসঙ্কল্প। আত্ম-হত্যা মহা পাপ, এ জ্ঞান তাঁহার এক্ষণে নাই; আত্ম-হত্যা পরম সুখের সোপান বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে।

বহুক্ষণ যবনিকার অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া, ধীরে ধীরে সুরবালা তাহা অপসারিত করিলেন এবং ধীরে ধীরে রমাপতি বাবুর গৃহে প্রবেশ করিয়া, ধীরে ধীরে তাঁহার শয্যা-প্রান্তে উপবেশন করিলেন। রমাপতি তাঁহার আগমন বুঝিতে পারিলেন বটে, কিন্তু কোনই কথা কহিলেন না—একবার ঘাড়টা তুলিয়া ফিরিয়াও চাহিলেন না! সুরবালা বহুক্ষণ সেই স্থানে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"আমি তোমাকে কোন প্রকার প্রবোধ দিয়া বিরক্ত করিতে আসি নাই। দুইটা কথা বলিব মনে করিয়াছি, শুনিবে কি?"

রমাপতি একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন,

"সুকুমারী নাই, আমার ভ্রম, হইয়াছে, এরূপ কাণ্ড সম্পূর্ণ অসম্ভব, এ সকল কথা তোমার মুখে দশ হাজার বার শুনিয়াছি; তাহাই কোন রূপান্তর করিয়া এখন আবার বলিবে বোধ হয়। আমি সেরূপ কথা কর্ণে ষ্ঠাঁই দিব না জান, তথাপি এ প্রকারে আমাকে কষ্ট দেওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতা।"

সুরবালা নিতান্ত বিনীত ভাবে বলিলেন,—

"তোমার মনের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তোমার সহিত এ সময়ে কোন কথা কহিয়া, তোমাকে ত্যক্ত করাই নিষ্ঠুরতা। কিন্তু আমি তোমাকে দিদির সম্বন্ধে আজ কোন কথাই বলিব না। আজি আমি তোমাকে নিজের দুইটা কথা বলিব, কৃপা করিয়া যদি শুন।"

রমাপতি বলিলেন,—"তোমার নিজের কথা! তোমার এমন কি কথা আছে, যে এখনই না শুনিলে চলিবে না? কৃপা করিয়া আজ আমাকে ক্ষমা কর, যাহা বলিবে দুদিন পরে বলিও।"

সুরবালা নীরব। এ কথার পর তিনি কি বলিবেন? যে দেবচরণে তিনি প্রাণ উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন, সেই দেবতার আজি এই ভাব!

তাঁহার চক্ষে জল আসে আসে হইল, কিন্তু আসিল

না। কণ্ঠস্বর কিছু বিকৃত হইয়া উঠিল। তিনি সেই স্থূল স্বরে আবার বলিলেন,—

'দুই দিন পরে আমার আর তোমার সহিত সাক্ষাতের সময় হইতে না পারে।"

সুরবালার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই রমাপতি মুখ ফিরাইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। বোধ করি সুরবালার কণ্ঠস্বর তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিল। তিনি বলিলেন,—

"সময় হইবে না—সে কি কথা সুরবালা ?"

এতক্ষণে সুরবালার চক্ষু হইতে অজস্র ধারে অশ্রু-বর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি, কাঁদিতে কাঁদিতে উভয় বাহুদ্বারা রমাপতির পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন,—

"অদ্যকার সাক্ষাৎই আমাদের ইহ জীবনের শেষ সাক্ষাৎ। তোমার প্রেমময় হৃদয়ের এ অসহনীয় যাতনা তোমার এ দাসী আর এক দিনও দেখিবে না। তোমার দাসী হইয়াও যখন তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না, তোমার তীব্র শোকের কোন প্রতিবিধান করিতে পারিলাম না, তখন বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ ? দয়াময়! তোমার দাসী তাই আজি এত আগ্রহ সহকারে তোমার চরণে চির বিদায় প্রার্থনা করিতেছে।"

কথাটা রমাপতি বাবুর হৃদয়ে বাজিল বুঝি। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। সুরবালা তখনও তাহার চরণে পতিতা! তিনি সাবধানে সুরবালাকে উঠাইলেন। তিনি জানিতেন, সুরবালা কখন মিথ্যা কথা কহেন না এবং তাঁহার হৃদয় কপটতার বার্ত্তা জানে না। তখন রমাপতি বলিলেন,—

"সুরবালা! তুমি সত্যই কি প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছ?"

সুরবালা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,

"বল দেবতা আমার আর কি উপায় আছে? তোমার প্রসাদ সম্ভোগ, তোমার আনন্দ সন্দর্শন, তোমার সুখ ও সন্তৃপ্তি আমার জীবনের মূল্য। তাহা আর তোমাতে নাই; অতএব আমার জীবনের আর কোনই মূল্য নাই। যাহাতে তোমাকে আনন্দময়, সুখময় ও প্রসাদময় করা যাইবে বুঝিতেছি তাহা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। অনেক সন্ধান করিলাম, অনেক যত্ন করিলাম, দিদির সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। অতএব তোমার চিত্তে শান্তি সঞ্চারের আর উপায় নাই। এইরূপ কাতর ভাবে, এইরূপ অনাহারে ও অনিদ্রায় কালাতিপাত করিতে হইলে, তোমার জীবন যে আর সপ্তাহ কালও টিকিবে না, তাহা আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি। তুমিও কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না?

তবে বল দেবতা, বল সর্ব্বস্বধন, আমি জীবন রাখি কোন সাহসে? তুমি আমাকে বড় ভালবাস জানি তুমিই বল, তোমার সেই নিশ্চিত বিষাদময় পরিণামের পূর্ব্বে, আমার চির-পলায়ন নিতান্তই আবশ্যক নয় কি?"

রমাপতি বহুক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—

"সুরবালা, আমার জীবন যদি থাকে সে তোমারই জন্য থাকিবে, আর যদি যায় সে তোমারই জন্য যাইবে। মনে করিয়া দেখ সুরবালা, এ জীবন রাখিয়াছে কে? তুমি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জান; সেই মন্ত্র বলে তোমার এই মন্ত্র-মুগ্ধ অনুগত মরিলেও আবার বাঁচিয়া উঠিবে। তুমি আমাকে বাঁচাইয়া দেও দেবী—এ যাতনা আমি আর সহিতে পারি না।"

এই বলিয়া রমাপতি উভয় বাহুদ্বারা সুরবালাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। সুরবালা মনে মনে বলিলেন,— "আমার প্রাণের প্রাণ, তোমার দাসী তোমার জন্য প্রাণপাত করিয়াও যে সুখ পায়, তাহারই কি তুলনা আছে? হায়! আজি যদি প্রাণ দিলেও দিদিকে দেখিতে পাইতাম।"

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

উত্তরোত্তর রমাপতি বাবুর অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতে থাকিল। সংসারে মন নাই, বিষয়-কর্ম্মে আস্থা নাই, হৃদয়ে উৎসাহ নাই, শরীরে বল নাই। দেহ অবসন্ন, কাতর ও বহুবিধ ব্যাধিগ্রস্ত। প্রথমতঃ মস্তিষ্কের কাতরতা, তাহা হইতে অবসাদ, তদনন্তর অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ, তদনন্তর অত্যধিক দুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতা জন্মিয়াছে। অন্তরে অণুমাত্র প্রসন্নতা নাই, কোন কারণেই আনন্দ নাই, কিছুতেই যত্ন নাই।

তবে আছে কি? আছে কেবল কর্ত্তব্য-জ্ঞান। সেই কর্ত্তব্য-জ্ঞানের প্রবল শাসন তাঁহাকে এখনও অধীন করিয়া রাখিয়াছে। সেই কর্ত্তব্য জ্ঞানের প্রভাবে তিনি বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার জীবনে তাঁহার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও, তাহাতে সুরবালার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। তিনি বুঝিয়াছেন, সুকুমারী তাঁহার অতীতের স্মৃতি, মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের বিদ্যুৎক্রীড়া, মরুভূমির মরীচিকা, মোহকর স্বপ্ন-বিকাশ, কিন্তু সুরবালা তাঁহার বর্ত্তমানের আনন্দোৎস, সুনির্ম্মল আকাশের স্নিগ্ধোজ্জ্বল ধ্রুবতারা, প্রতপ্ত জ্বালাজনক বালুকাপুঞ্জ পূর্ণ-ক্ষেত্রমধ্যস্থ

শীতলাশ্রয় এবং জাগ্রত কালের প্রত্যক্ষ সুখ। সুকুমারীর স্মৃতি অপরিহার্য্য। তদীয় পুনর্দর্শনলাভ, অবিচ্ছেদ্য কামনার বিষয় হইলেও, তজ্জন্য দারুণ দুশ্চিন্তায় দেহপাত করিয়া, সুরবালার সর্ব্বপ্রকার সুখ বিধ্বংস ও সর্ব্বনাশ সাধন করা একান্ত অবৈধ ও অব্যবস্থা। তিনি সুকুমারীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, তিনি তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছেন, তিনি তাঁহার চরণ ধরিয়া রোদন করিয়াছেন, তথাপি সুকুমারী আর তাঁহার সঙ্গিনী হইতে সম্মত হন নাই। আর সুরবালা, রোদন দূরে থাকুক, তাঁহাকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে দেখিলে, প্রাণ ফাটিয়া মরে; সঙ্গিনী হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার সেবিকা হইতে পাইলেই চরিতার্থ হয়। সেই সুকুমারীর জন্য এই সুরবালার মর্ম্মপীড়া উৎপাদন করিতে রমাপতি অশক্ত। তিনি বুঝিয়াছেন, সুকুমারী আর তাঁহার কেহ নহেন—সুরবালাই সর্ব্বস্ব। জীবিতা বা মৃতা-সুকুমারী উভয়ই তাঁহার কাছে এখন তুল্য মূল্য।

কিন্তু এত বুঝিয়াও রমাপতি মনকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিতেছেন না; এ ভয়ানক দুর্ব্বলতা তিনি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। সুরবালা সতত তাঁহার সমীপে থাকিয়া এবং প্রতিনিয়ত কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে বিনোদিত করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিয়াও, তাঁহার কোনরূপ দৈহিক উন্নতি সাধিত করিতে পারিতেছেন না।

আয়ুর্ব্বেদ এলোপ্যাথি, এবং হোমিওপ্যাথি সম্মত রাশি রাশি ঔষধ সুরবালা তাঁহাকে গিলাইতেছেন, কিন্তু সকলই ভস্মাহুতি হইতেছে। কবিরাজ ও ডাক্তার প্রতিদিন রাশি রাশি টাকা দর্শনী লইয়া বিদায় হইতেছে, কিন্তু ফল কিছুই হইতেছে না। ক্রমে ব্যাপার বড় ভয়ানক হইয়া উঠিল। চিকিৎসকেরা রমাপতি বাবুর জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইলেন। আত্মীয়জনেরা মুখভার করিয়া চুপি চুপি কথা কহিতে আরম্ভ করিল। অধীনস্থ লোকেরা বিষণ্ণ-বদন হইল। সকলেই বুঝিল যে, এ যাত্রা রমাপতি বাবু যেন রক্ষা পাইবেন না। কেবল বুঝিল না এক জন। সুরবালার মনে এ দুশ্চিন্তা একদিনও হইল না। তিনি আশায় বুক বাঁধিয়া, অনন্যমনে পতিসেবায় নিযুক্ত রহিলেন।

প্রাণের মাধুরী আর খোকার কথা তখন আর সুরবালার মনে নাই। তাহারা ঝিদের কাছেই থাকে। জননী তাহাদের কথা ভাবেন কি না সন্দেহ। তাহারা মাতৃস্নেহের অভাবে ম্রিয়মাণ ও বিশুষ্ক হইতে থাকিল। সুরবালার স্নান নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, তিনি নিরন্তর স্বামী-সেবায় নিবিষ্টচিত্ত। সুরবালার সে মূর্ত্তি নাই, সে শোভা নাই। এখন সুরবালাকে দেখিলে, বলিয়া দিলেও চেনা ভার।

শয্যাগত রমাপতি সকলই বুঝিতেছেন। এরূপ

ব্যাধির হস্ত হইতে আরোগ্য লাভ করা নিতান্ত অসম্ভব তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছেন। সুরবালার এইরূপ পরিবর্ত্তনও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। এই ব্যাপারের পরিণাম চিন্তা করিয়া, প্রেম-প্রবণ-প্রাণ রমাপতি নিতান্ত ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া রহিলেন। ব্যাধিজনিত যাতনা তাঁহার চিত্তকে অভিভূত করিতে সক্ষম হইল না। কিন্তু সুরবালার কি হইবে—তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তদ্গতপ্রাণা সুরবালার কি হইবে, ইহাই তাঁহার যাতনার প্রধান কারণ। যে সুরবালার তিনি সর্ব্বস্ব, যে সুরবালা তাঁহাকে হৃদয়ের হৃদয় হইতে ভাল বাসেন, তাঁহার প্রাণান্ত ঘটিলে, সেই সুরবালার কি দশা হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া, সেই ব্যাধিক্লিষ্ট রমাপতি সততই যার পর-নাই যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে রমাপতি এ সকল কথা সুরবালাকে ভাল করিয়া বুঝাইতে সঙ্কল্প করিলেন।

এইরূপ অভিপ্রায় স্থির করিয়া, একদিন মধ্যাহ্নকালে রমাপতি, ক্রমশঃই অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া আসিতেছে জানিয়া, সুরবালাকে বলিলেন,—

"মনুষ্যের শরীর কখনই চিরস্থায়ী নয়। আজি হউক, বা দশদিন পরে হউক, সকলকেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইবে। আমাদের পিতা মাতা ছিলেন; তাহারা এখন নাই। তোমার এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের আধার স্বরূপ শরীরও কোন সময়ে ধ্বংস হইবে। সুর-

বালা! আমার সেই অপরিহার্য্য মৃত্যুকাল সম্প্রতি প্রায় উপস্থিত হইয়াছে। আমি মরিয়া গেলে, সুরবালা তুমি কি করিবে তাহা কখন ভাবিয়াছ কি ?"

সুরবালা বলিলেন,—

"তাহা আমি বলিব না। মৃত্যু যে ধীরে ধীরে তোমাকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে, তাহা আমি জানি। কিন্তু সে জন্য আমার কোন ভয় বা ভাবনা নাই। তোমাকে বাঁচাইতে পারা আমার প্রধান কামনা। যদি তাহাতে আমি কৃতকার্য্য না হই, তাহা হইলেও, ভাবনার কারণ কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।"

সুরবালার চক্ষে জল নাই। হৃদয়ে কি আছে, ভগবান জানেন, কিন্তু বাহ্যতঃ সেই মলিনা ও কৃশকায়া সুন্দরীর বদনে বিশেষ উদ্বেগের কোন লক্ষণ নাই। এরূপ ভাব দেখিয়া রমাপতি বাবু কিছু আশ্বস্ত হইলেন কি ? না। তিনি, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বলিলেন,—

"সুরবালা! তোমার সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, মনুষ্য বহুবিধ কর্ত্তব্যের অধীন হইয়া সংসারে থাকে। তোমার স্কন্ধেও নানাবিধ গুরুভার অর্পিত আছে। আমার অবর্ত্তমানে তোমাকে একাকিনী জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হইবে। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দৃষ্টিশূন্য হওয়া নিতান্ত অব্যবস্থা। অতএব সে সম্বন্ধে তুমি কি স্থির করিয়াছ ?"

সুরবালা বলিলেন,—

"আমার যাহা সাধ্য তাহা আমি অবশ্যই করিব। যাহা আমার অসাধ্য তাহা আমি করিব কি করিয়া?"

রমাপতি বলিলেন,—

"তুমি স্বীকার না করিলেও, আমি বুঝিয়াছি, আমার প্রাণান্ত হইলে, তোমারও প্রাণান্ত হইবে। কিন্তু মনে করিয়া দেখ, অন্য সকল কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিলেও মাধুরী ও খোকার ভাবনা ভাবিতে তুমি অবশ্যই বাধ্য। ভাবিয়া দেখ তাহাদের কে রক্ষা করিবে?"

"ঈশ্বর।"

রমাপতি আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু সুরবালা আবার বলিলেন,—

"কিন্তু তোমাকে বাঁচাইতে পারা আমার নিতান্তই আবশ্যক। এখনও তোমার সেবা করিয়া আমার হৃদয় একটুও তৃপ্ত হয় নাই। হায়! এ সময়ে দিদিকে যদি একবার ধরিতে পারিতাম।"

"তোমার দিদিকে ধরিতে পারিলেই যে আমাকে আর বাঁচাইতে পারিবে এমন আমার বোধ হয় না। তোমার দিদির অভাবজনিত যে যাতনা, অনেক দিন হইতেই তাহা আমার ছিল না; সে অভাব তোমার কৃপায় আবশ্যকের অধিক সম্পূরণ হইয়াছে। কিন্তু যাহার জীবন নাই বলিয়া মনে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, ইহ জীবনে যাহার

সহিত আর কখন সাক্ষাৎ ঘটিবে না বলিয়া জানিতাম সেই সুকুমারীকে, সহসা অসম্ভব স্থানে সম্পূর্ণ অচিন্তিত-পূর্ব্ব মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া আমার হৃদয় নিতান্ত আলোড়িত ও বিচলিত হইয়াছে। তাহার পর, সুকুমারীর তৎসময়ের কার্য্যাদি বিবেচনা করিয়া, আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই তিনি অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তৎকাল হইতে আমার চিত্ত অতিশয় অভিভূত হয়। সেই সকল চিন্তা হইতে আমার বর্ত্তমান পীড়ার উৎপত্তি হইলেও, ক্রমশঃ নানাপ্রকার পীড়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, এবং অধুনা আমি সম্পূর্ণরূপে সুকুমারীর চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারিলেও, অন্যান্য পীড়ার হস্ত হইতে আমার নিস্তারের কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মরণের পূর্ব্বে, একবার সেই ভৈরবীকে দেখিতে পাইলে, আমার বড়ই আনন্দোদয় হইত এবং আমি আরোগ্য লাভ না করিলেও, আমার যে বিশেষ সন্তোষ জন্মিত তাহার কোনই সন্দেহ নাই।"

তখন সুরবালা বলিলেন,—

"হায়! কি করিলে সেই দেবীর সাক্ষাৎ পাইব? যদি সর্ব্বস্ব দিলে সেই দেবীকে একবার এই স্থানে আনিতে পারিতাম! তিনি যদি অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া থাকেন—যদি তাঁহার দেবত্বই হইয়া থাকে তাহা হইলে, তিনি এই দুঃখিনীর মর্ম্মপীড়ার কথা বুঝিতে পারিতেছেন না কি? এই অন্তিম শয্যাশায়ী ব্যক্তির

বাসনার কথা জানিতে পারিতেছেন না কি? হায় কোথায় তিনি!”

সঙ্গে সঙ্গে, বীণাবিনেন্দিত সুকোমল স্বরে, প্রকোষ্ঠের প্রান্তদেশ হইতে, শব্দ হইল,—

“এই যে!”

রমাপতি ও সুরবালা চমকিত হইয়া সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন কি?

দেখিলেন সেই সুবিস্তৃত কক্ষের ভিত্তিতে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া, এক ঈষদ্ধাস্যমুখী ভুবনমোহিনী সুন্দরী দণ্ডায়মানা। রমাপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—

“সুকুমারী! আসিয়াছ? এই অন্তিম সময়ে দয়া করিয়া, আমাকে দেখা দিতে আসিয়াছ? সুরবালা, ঐ সেই সুকুমারী। যখন আমাদের নৌকা ডুবিয়াছিল তখন তোমার যে বেশ ছিল, আজি, সুকুমারি, তুমি সেই বেশে, এ অধীনকে দেখা দিয়া ভালই করিয়াছ।”

তখন সুরবালা “দিদি! দিদি!” শব্দে চীৎকার করিতে করিতে সেই সুন্দরীর নিকটস্থা হইলেন।

---

# শান্তি।

## দ্বিতীয় খণ্ড।

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

মেদিনীপুর হইতে ময়ূরভঞ্জ যাইবার পথের পাশে বড়ই বন। সহর হইতে পশ্চিম দিকে কয়েক ক্রোশ মাত্র গমন করিলেই বনের আরম্ভ দেখা যায়; ক্রমশঃ সেই বন নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়াছে। অধুনা যে ক্ষুদ্র-পল্লী ও বাঁধ গোপ নামে পরিচিত, শুনা যায় পূর্ব্বকালে তাহা বিরাটের গো-গৃহ ছিল। সেই গোপ-পল্লী অতিক্রম করিয়া, আরও কয়েক ক্রোশ পশ্চিমাভিমুখী হইলে, বনের সূত্রপাত দেখা যায়। মেদিনীপুরের কাছারি হইতে এবং অট্টালিকাদির উপর হইতে, এই সুদূরব্যাপি ঘনারণ্যের দূরাগত শোভা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই বনকে বিভিন্ন করিয়া, ময়ূরভঞ্জাভিমুখে মনোহর রাজবর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে দুর্ভেদ্য অরণ্য।

সেই অরণ্যের এক ঘনতম প্রদেশে প্রস্তরবিনির্ম্মিত এক সুবিস্তৃত অট্টালিকা পরিস্থাপিত আছে। রাজপথ হইতে সেই সুবৃহৎ ভবনের কোন অংশই পরিদৃষ্ট হয় না এবং তাহার বিদ্যমানতাও কেহ অনুমান করিতে পারে না। তথায় গমনাগমনের কোন পথ দেখা যায় না; সুতরাং লোকে কখন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহও করে না।

কিন্তু সেই সুরম্য অট্টালিকা জনহীন নহে। তাহা বহুতর নরনারীর আবাসস্থল। তত্রত্য অধিবাসীবৃন্দ সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে কেন থাকে, সেই বাঘ-ভালুক-বেষ্টিত বনে তাহারা কেন বাস করে, সেখানে তাহারা কি খায় ইত্যাদি বিবরণ নিরতিশয় কৌতূহলজনক। আসুন পাঠক, আমরা সাহসে ভর করিয়া, সেই বনমধ্যস্থপুরীর অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করি।

রজনী গভীরা। দিবাভাগেও যে বনভূমি দারুণ তমসাচ্ছন্ন, এই ঘোর নিশাকালে, তথায় অন্ধকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু সেই বিশাল ভবনের কোন কক্ষ হইতে আলোকজ্যোতিঃ দেখা যাইতেছে। পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, যে কক্ষে সমুজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে, তথায় উপস্থিত হইলে, দেখা যায় যে, তাহা একটী দেবালয়। আহা কি মনোহর! কি ভুবনমোহন! কক্ষমধ্যে রজত-মঞ্চে শিখিপুচ্ছচূড়াধারী, বংশীবদন, হাস্যমুখ, স্মেরোৎফুল্ল লোচন, অপরূপ বঙ্কিমরূপ শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি বিরাজিত; বামে অতসীকুসুমসঙ্কাশা, বিকসিতাননা, প্রেমপ্রদীপ্ত-লোচনা, প্রেমময়ীর মোহিনী মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। বিগ্রহদ্বয়ের যেখানে যে অলঙ্কার সাজে, সেখানে তাহাই হইয়াছে। মস্তকোপরি স্বর্ণ-সূত্র-বিনির্ম্মিত এবং মুক্তা-ঝালর-সমন্বিত এক চমৎকার ঝালর। হরি হরি! কি

শোভা! সর্ব্বরূপের কেন্দ্র ও সর্ব্বশোভার উৎপাদক নহিলে, এত শোভা আর কাহাতে সম্ভবে? হায় হায়! বিগ্রহ যেন সজীব ও বাঙ্ময়। যিনি সর্ব্বব্যাপী, ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার লোমকূপে, তিনি যে এখানেও আছেন, তাহার সন্দেহ কি? কিন্তু এরূপ যুক্তি ভক্তের বড়ই কর্ণজ্বালা-কর। ঐ মূর্ত্তিই তিনি, ঐ মূর্ত্তিই সাক্ষাৎ ভগবান্, এই কথাই ভক্ত ভাল বাসে এবং ইহাই জানে।

সেই কক্ষে এক কৃষ্ণকায়া, রক্ষকেশা, ধর্ম্মতেজোদ্দীপ্তা, অলৌকিক-শ্রীসম্পন্না নারী বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া হাস্যমুখে সেই মঞ্চাসীন নারায়ণ মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এইরূপে বহুবার দেবদর্শন করার পর, সেই পুণ্যতেজঃ-প্রদীপ্তা সুন্দরী, বিগ্রহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—

"আজি তুমি বড়ই দুষ্ট হইয়াছ! আমার কথা তুমি আজি শুনিতেছ না। আমি সন্ধ্যা হইতে আহার করিবার জন্য, তোমাকে সাধাসাধি করিতেছি, তুমি তাহা শুনিতেছ না। দেখ দেখি রাত্রি কত হইল এখনও তোমার খাওয়া হইল না। আচ্ছা, থাক তুমি। আসুন আগে শান্তিদেবী। তাহার পর তোমাকে মজা দেখাইব এখন।"

কিয়ৎকাল পরে আবার বলিলেন,—

"দুষ্ট! কথা না শুনিয়া আবার হাসি। তোমার বড়ই নষ্টামি হইয়াছে।"

পরে, শ্রীরাধিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—

"আর তুমিই বা কেমন মেয়ে গা? দুষ্ট ছেলে না খায় না খাবে, তুমিই বা কেন খাওনা বাছা?".

এইরূপ সময়ে এক অপার্থিব রূপ-প্রভা-সম্পন্না, মূর্ত্তি-মতী পুণ্যস্বরূপা, শোভাময়ী সুন্দরী সেই স্থানে সমাগতা হইলেন। তাঁহার আগমনে সমস্ত গৃহ যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আসিয়াই সেই কৃষ্ণকায়া সুন্দরীকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"কি হইতেছে সুরমে? ছেলে মেয়ের সহিত ঝগড়া বুঝি?"

সুরমা বলিলেন,—

"শান্তি আসিয়াছ? দেখ দেখি মা, এত রাত্রি হইল, এখনও ছেলে মেয়ে খাইতে চাহে না। আমি যত বলিতেছি, ততই আমার কথা কেবল হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছে। বড়ই দুষ্ট হইয়াছে। তুমি আসিলেই উহারা জব্দ হইবে বলিয়াছি। এখন তুমি আসিয়াছ মা, উহাদের যা বলিতে হয় বল।"

শান্তি বলিলেন,—

"তোমার ছেলে মেয়ে আজি নূতন করিয়া দুষ্ট হন নাই; চিরদিনই এইরূপ দুষ্ট। খাওয়ার কথা আমি

বলিতে পারি না ; কিন্তু দুষ্টামির আমি এখনই প্রতিকার করিতে পারি। কেমন প্রভো! আবারও জব্দ হইবার সাধ আছে কি ?"

তাহার পর সুরমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,--

"না,. আর তোমার ছেলে দুষ্টামি করিবে না। আমি এখন আসি। হরি! আমাকে যে কাজে নিযুক্ত করিয়াছ, আমি এখনও তাহা শেষ করিয়া উঠিতে পারি নাই। তোমার কৃপা নহিলে তাহা শেষ হইবে না। তুমিই জান, কতদিনে তাহা শেষ করাইবে। সুরমে! আমি এখন গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই-তেছি। তোমার ছেলে মেয়ে ঘুমাইলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও ; তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে।"

এই বলিয়া সেই সুকুমার-কায়া সুরসুন্দরী হাস্যমুখে সেই দেবচরণে প্রণাম করিলেন এবং ঈষদ্ধাস্য সহকারে, দেব দম্পতীকে একটি ছোট কিল দেখাইয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সেই সুবৃহৎ ভবনের পার্শ্বে, চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত স্বতন্ত্র ও ক্ষুদ্র একটি যোগমঠ ছিল। তথায় নিবিড় অন্ধকার মধ্যে এক ধ্যানমগ্ন পুরুষ উপবিষ্ট। তাঁহার সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। সেই অগ্নির জ্যোতিঃ তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবরে ও শ্মশ্রু সমাবৃত বদনে নিপতিত হইতেছে। তিনি কৌপীনধারী। তাঁহার বয়স কত তাহা দেহ দেখিয়া অনুমান করা অসাধ্য। পঞ্চাসের অধিক হইবে না বলিয়া বোধ হয়। চুল একটিও পাকে নাই। শরীর শীর্ণ, অথচ উজ্জ্বল এবং পেশল। দেহ দীর্ঘাকার।

বহুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকার পর, সেই যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিবামাত্র আমাদের পূর্ব্বদৃষ্টা শান্তি নাম্নী সেই সুন্দরী তাঁহার চরণে প্রণতা হইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিলেন,—

"শান্তি! কতক্ষণ আসিয়াছ? কোন বিঘ্ন ঘটে নাই তো?"

"প্রভো! কিয়ংকাল পূর্ব্বেই আসিয়াছি। প্রথমে হরিমন্দিরে গিয়া শ্যামসুন্দরকে সমস্ত সংবাদ জানাই-

য়াছি, তাহার পরই প্রভুর নিকট আসিয়াছি। বিঘ্ন কাহাকে বলে তাহা তো জানি না প্রভু। জানি কেবল ঐ শ্যামসুন্দর ঠাকুর, আর এই জ্ঞানানন্দ ঠাকুর। যেখানেই যাই, আর যাহাই করি, সততই বুঝিতে পারি, ঐ শ্যামসুন্দর আর এই জ্ঞানানন্দ আমার সঙ্গেই আছেন। তবে আর বিঘ্ন করিবে কে? হৃদয় যদি বা কখন একটু দুর্ব্বল বোধ হয়, তাহা হইলে যেই একবার চক্ষু মুদিয়া প্রভুকে ভাবি, অমনই সকল সাহস ও বলই পাই; অমনই দেখি এক পার্শ্বে শ্যামসুন্দর আর এক পার্শ্বে জ্ঞানানন্দ। তবে প্রভো! আমার বিঘ্নের আশঙ্কা করিতেছেন কেন?"

জ্ঞানানন্দ বলিলেন,—

"বৎসে! শ্যামসুন্দর যাহাকে আপনার বলিয়া জানেন এবং যে শ্যামসুন্দরকে আপন বলিয়া জানে, তাহার কদাপি কোন আশঙ্কা থাকে না। এ পাপ ধরায় তোমার ন্যায় জীবের আবির্ভাব ভগবানের লীলা প্রকাশের উপায়মাত্র। পীড়িত সুস্থ হইয়াছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"কি কি উপায় অবলম্বন করিলে?"

"আমাকে দর্শনমাত্র পীড়িত বিশেষ উৎসাহিত হইলেন এবং তাঁহার দেবীর ন্যায় পত্নী, আন্তরিক

উৎসাহ-সহকারে আমার নিকটস্থ হইয়া, আমার হস্তধারণ করিলেন। আমাকে তিনি তাঁহার স্বামীর শয্যাসমীপে লইয়া গেলেন। তথায় উভয়ে, নানাপ্রকার প্রীতি ও অনুরাগের কথা বলিয়া, আমাকে বিমোহিত করিবার চেষ্টা করিতে থাকিলেন। কারাগারে তাঁহার কথা শুনিয়া, আমি, একবার সহসা জ্ঞানশূন্যা হইয়া, কিয়ৎ-কালের জন্য, বিমোহিত হইয়াছিলাম এবং সে ত্রুটির কথা প্রভুর চরণে নিবেদন করিয়াছিলাম। এবার পাছে সেইরূপ কোন মতিভ্রম ঘটে এই আশঙ্কায়, তাঁহারা যখন কথা কহিতে থাকিলেন, তখন, আমি নিরন্তর প্রভুর চরণ ধ্যান করিতে থাকিলাম। ভাগ্যবলে এবার আর কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিল না।"

"তার পর?"

"তার পর প্রভুর উপদেশানুসারে, কায়মনো-বাক্যে প্রভুকে স্মরণ করিয়া, পীড়িত ব্যক্তির শরীরে বল সঞ্চারের প্রার্থনা করিলাম। শ্যামসুন্দর দাসীর প্রর্থনা পূরণ করিলেন। পীড়িত বলিলেন,—'তাঁহার আর কোন দুর্ব্বলতা নাই।' তদনন্তর তিনি আহারে অপ্রবৃত্তি জানাইলে, আমি তাঁহার জন্য খাদ্য আনিতে বলিলাম। তিনি স্বচ্ছন্দে প্রচুর প্রমাণ খাদ্য উদরস্থ করিলেন। তাহার পর, স্বামীস্ত্রীতে, আমাকে তাঁহাদের গৃহবাসী করিবার নিমিত্ত বহুতর প্রযত্ন

করিলেন; কিন্তু আমি স্বীকার হইলাম না। ভাল মন্দ জানি না, কিন্তু আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের দেখা দিতে স্বীকার করিয়া আসিয়াছি। আর প্রভুর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহাদিগকে তীর্থ যাত্রার পরামর্শ দিয়াছি।"

"বেশ করিয়াছ। যেরূপে হউক, এই সাধু-যুগলকে আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত করিতে হইবে; সেজন্য তোমার মধ্যে মধ্যে যাতায়াত রাখা আবশ্যক হইবে। আবার কবে যাইবে স্থির করিয়াছ?"

"প্রভু যে দিন আজ্ঞা করিবেন। সপ্তাহ মধ্যে দর্শন দিব বলিয়াছি। এক্ষণে প্রভুর ইচ্ছা।"

"তাহাই হইবে। তোমার অনুপস্থিত কালে তোমার এই শান্তিনিকেতনে আর দুইটি নিতান্ত উগ্রস্বভাব ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাদের সহিত তোমার পরিচয় হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। নচেৎ তাহা-দের উন্নতির উপান্তর নাই।"

অবনত মস্তকে শান্তি বলিলেন,—

"তাহাদের স্বভাব কি নিতান্ত কলুষিত? তাহারা কি নিতান্তই উচ্ছৃঙ্খল?"

"যৎপরোনাস্তি। সে জন্য তাহাদের সহিত পরি-চয় করিতে তুমি কি ভয় পাইতেছ?"

"কিসের ভয় প্রভো? প্রভুর উপদেশ যদি শুনিয়া থাকি তাহা হইলে ভয়ের সম্ভাবনা ইহ জগতের কোথায়ও

নাই। সুখ-দুঃখ, মানাপমান, কার্য্যাকার্য্য, আত্মপর, সকল বোধই বর্জ্জন করিতে প্রভুর নিকট উপদেশ পাইয়াছি। কার্য্য করি প্রভুর আজ্ঞায়, কার্য্য করি না প্রভুর আজ্ঞায়। ফলাফল প্রভুর চরণে নিবেদন করি। সে কার্য্যে লাভালাভ কি, তাহা প্রভুই জানেন। কথনই তাহা জানিতে আমার কামনা নাই। সে দুই ব্যক্তি কোথায় আছে?"

"অদীক্ষিতগণ প্রথমে যেথানে থাকে, তাহারা এথন সেই অংশেই আছে।"

"প্রভুর এক্ষণে আর কোন আজ্ঞা নাই?"

"না মা।"

"তবে এথন আসি দয়াময়?"

"এস বাছা।"

শান্তি পশ্চাদাবর্ত্তন করিলে, জ্ঞানানন্দ মনে মনে বলিলেন,—

"ইহ সংসারে যদি কেহ কথন নিষ্কাম ধর্ম্ম শিথিয়া থাকে, সে তুমি। সার্থক আমার যোগ-চর্চ্চা ও সার্থক আমার সাধনা। শ্যামসুন্দর জীবের প্রতি নিতান্ত করুণা-পরবশ হইয়াই তোমার ন্যায় দেবীকে সময়ে সময়ে ধরাধামে প্রেরণ করেন। তুমি আমার শিষ্যা হইলেও, আমি তোমার শিষ্য হইবারও যোগ্য নহি। তোমার সাহস, তোমার ধীরতা, তোমার সদ্বিবেচনা, তোমার পবিত্রতা, তোমার ধর্ম্মময়তা সকল

সদ্‌গুণেরই প্রচুর পরীক্ষা হইয়াছে। বৎসে! আজি তোমাকে যে ভার দিয়াছি, তাহাতেই তোমার তেজের পরীক্ষা হইবে। যোগপথে এত দিন পর্য্যটন করিয়া, যদি কিছুমাত্র ঐশ্বর্য্য * সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়া থাকি, সে উন্নতি, আমার কামাবসায়িতা হেতু, তোমারই দেহকে আশ্রয় করিয়াছে। অতএব বৎসে! তোমার পরীক্ষায় আমার আত্মপরীক্ষা হইবে।"

শান্তি গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কিয়দ্দূর আগমন করিতে না করিতে, হরিমন্দিরে মঙ্গলারতি-সূচক বাদ্য-ধ্বনি উঠিল। সেই বাদ্য-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, শান্তি সর্ব্বাগ্রে হরিমন্দিরে গমন করিলেন।

তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই বিগ্রহযুগলের

* যোগবলে অষ্টৈশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া যায়। সেই অষ্টৈশ্বর্য্যের কথা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে পরিস্ফুট আছে,—

"অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রাকাম্যং মহিমেশিতা।
বশিকামবসায়িত্বে ঐশ্বর্য্যমষ্টধা স্মৃতম্॥"

অর্থাৎ অণিমা (আবশ্যকানুসারে দেহকে সঙ্কুচিত করিবার ও সূক্ষ্ম করিবার শক্তি), লঘিমা (দেহ লঘু করিবার শক্তি), ব্যাপ্তি (সকল-স্থানে বিদ্যমান থাকিবার শক্তি), প্রাকাম্য (ভোগবাসনা পূরণ শক্তি), মহিমা (দেহ সংবর্দ্ধিত করিবার শক্তি), ঈশিতা (শাসন করিবার শক্তি), বশী (বশীভূত করিবার শক্তি), কামাবসায়িত্ব (কামনা পূরণ শক্তি) এই আট প্রকার ঐশ্বর্য্য।

ইহারই নাম অষ্টসিদ্ধি। সকল যোগীই যে উল্লিখিত অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন এমন নহে। কদাচিৎ সাধুবিশেষে একাধিক ঐশ্বর্য্যের অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্য-বিশেষ তাদৃশ সিদ্ধ সাধু, মহাপুরুষনামে সমাজ মধ্যে সম্পূজিত হইয়া থাকেন।

পুরোবাসে গল-লগ্নিকৃত-বাসে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অনেক নরনারী দণ্ডায়মান। সকলেই সমান বেশধর ও প্রশান্ত মূর্ত্তি। নরনারী তাবতেরই দেহ সমস্থূল, গৈরিক-রাগ-রঞ্জিত বসনাবৃত। সম্মুখে এক বিপ্র রজত পঞ্চপ্রদীপ লইয়া, দেবারতি করিতেছেন। শান্তি সেই জনতার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মানা হইলেন। তৎকালে সকলেই আরতি দর্শনে নিবিষ্টচিত্ত; সুতরাং তাঁহাকে কেহই লক্ষ্য করিল না। আরতি সমাপ্ত হইল। সমবেত নর-নারীগণ ভক্তিভাবে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া, দেবচরণে প্রণাম করিতে থাকিল। সেই সময়ে সমুচ্চ ও অপ্সর বিনিন্দিত সুমিষ্ট স্বরে অপূর্ব্ব সঙ্গীত-ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া সমবেত সকলের হৃদয়-মন অপার্থিব আনন্দ রসে পরিপ্লুত করিয়া তুলিল। শান্তি গায়িতেছেন,—

"দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন
মুণিজনমানসহংস।
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন
যদুকুলনলিনদিনেশ॥
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন
সুরকুলকেলিনিদান।
অমলকমলদললোচন ভবমোচন
ত্রিভুবনভবননিদান॥

জনকসুতকৃতভূষণ জিতদূষণ
সমরশমিতদশকণ্ঠ।
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর
শ্রীমুখচন্দ্রচকোর॥”

সঙ্গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র সকলেই বুঝিল যে, গায়িকা শান্তি ভিন্ন আর কেহই নহেন। তখন তাবতেই সসম্ভ্রমে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সঙ্গীত ক্ষান্ত হইলে, সকলে ভক্তি-সহকারে শান্তিদেবীকে প্রণাম করিল; ‘শ্যামসুন্দর তোমাদিগের সকলকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্টচিত্ত করুন,’ বলিয়া শান্তি আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রণামকারিগণের মধ্যে শান্তির অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ নরনারী অনেকেই ছিলেন। তাঁহারা সকলে যখন শান্তি দেবীকে প্রণাম করিতেন, তখন তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে গুরুদেবকে স্মরণ করিতেন এবং প্রণামকারীগণকে উল্লিখিতরূপ আশীর্ব্বাদ করিতেন।

উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ একে একে শান্তির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শান্তি, সকলের সহিতই ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ক বাক্যালাপ করিয়া, প্রীতি বিকসিতাননে প্রত্যেককে বিদায় দিলেন। সেই দেবী তখন পুণ্যশীলা সুরমার সমীপস্থ হইলেন।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই শান্তি নিকেতনে ঊষার সঞ্চার হইল। সেই নিবিড়ারণ্য মধ্যে সম্মোহন বালারুণদ্যুতিঃ বিভাসিত হইল। পাদপাশ্রিত বিহঙ্গমকুল মধুর কূজনে ঊষা সমাগম সংঘোষিত করিল। দলে দলে শিখি-শিখিনী শান্তি-নিকেতনে আহারান্বেষণ কামনায় প্রবেশ করিল এবং ভয়চকিত হরিণগণও সেই হিংসা-দ্বেষ-বিরহিত পুণ্যপুরীর সমীপদেশে উপস্থিত হইল। সেই পুরবাসী দেবদেবীগণ, সূর্য্যোদয়ের বহুপূর্ব্বেই, ভক্তি সহকারে হরিনামোচ্চারণ করিতে করিতে, স্ব স্ব অজিন শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থান করিলেন এবং ললিত বিভাষরাগে মধুর স্বরে শ্যামসুন্দরের স্তোত্র পাঠ করিয়া, নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে মনোনিবেশ করিলেন।

এই সুবিশাল পুরীর অধিবাসিবৃন্দ কেহই ক্রিয়াহীন ও অলস নহেন। আশ্চর্য্য নিয়মাধীনতা সহকারে, তত্রত্য তাবতেই সমস্তদিন নিরন্তর ক্রিয়ানিরত। অপূর্ব্ব সুব্যবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া, কেহ বা হরিণ ও পক্ষীগণকে আহার প্রদান করিতেছেন, কেহ বা পুষ্পচয়ন করিতেছেন, কেহ বা হবিষ্যের আয়োজন করিতেছেন, কেহ বা

কাষ্ঠাহরণ করিতেছেন, কেহ বা পাকের আয়োজন করিতেছেন, কেহ বা পূজার আয়োজন করিতেছেন, ইত্যাকার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন লোক নিযুক্ত। কার্য্যের গুরুতা বিবেচনায় কোন কোন কার্য্যের দায়িত্ব একাধিক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত। কাহারও কার্য্যের সহিত কাহারও সংঘর্ষণ নাই; কাহারও সহিত কাহারও কথান্তর নাই; সকলেরই বদনে প্রীতিপূর্ণ মনোহর হাস্য ছটা। শান্তি ও আনন্দ সকলেরই সর্ব্বাঙ্গে মাখা। পুরুষ ও স্ত্রী সমভাবে ও ঘনিষ্ঠরূপে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত। কিন্তু কাহারও হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দুষ্প্রবৃত্তি নাই, কাহারও বদনে বিন্দুমাত্র অপবিত্রতা নাই, এবং কাহারও নয়নে তিলমাত্র লালসা নাই। সকলেই পর-দুঃখ-প্রবণ-হৃদয়, হরিভক্তি পরায়ণ এবং অসচ্চিন্তা বিবর্জ্জিত। অহো! কে বসুন্ধরায় এ স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করিল? স্বর্গে ইহার অপেক্ষা অধিকতর সুখকর আর কিছু আছে কি না জানি না।

সেই পুণ্যধামের সর্ব্বত্র এতাদৃশ বিমলানন্দ বিদ্যমান নাই। তত্রত্য যে নিভৃত অংশ আমরা অধুনা দর্শন করিবার বাসনা করিতেছি, তাহা সম্প্রতি দুঃখ ও অসততার আলয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তথায় দুইটি অতি পরুষমূর্ত্তি পুরুষ বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে। দেহের গঠন বিবেচনায়, তাহাদিগকে বিশেষ বলশালী বলিয়াই

বোধ হয়। তাহারা কৃষ্ণকায়, আরক্তলোচন এবং তাহাদের বাক্যালাপ শুনিয়া, অনুমান হয় যে, তাহারা যৎপরোনাস্তি মুর্খ, অসভ্য এবং কলুষিত-স্বভাব। তাহাদের কথাবার্ত্তার কিয়দংশ পাঠককে শুনাইতে ইচ্ছা আছে। একজন বলিতেছে,—

"মাইরি রামা, এ ত বড় জ্বালার জ্বালা হলো।"

রামা বলিল,—

"কি করা যায় বল্ দেখি ভাই?"

"দূর শালা! তাই যদি বল্‌তে পারব, তা হ'লে এত ভাবনাই কিসের?"

"বড় মুস্কিলেত পড়া গেল যেদো। থাসা ঘর, সম্মুখে ঢের যায়গা, কিন্তু বাবা চারিদিকে উঁচু দেওয়াল। হেঁচড়ে মেচড়ে যে পালাব তাহারও যো নেই, কোন দিকে অন্ধি সন্ধি নেই। একদিকে একটা দরজা আছে বটে, তাও লোহার; আবার আর এক দিক থেকে বন্ধ। হাজার ধাক্কা মার, ভাঙ্গিবে না বাবা। এমন দায়ে তো কখন ঠেকিনি রামা।"

রামা বলিল,—

"কে আন্‌লে, কেন আন্‌লে, কোথা দিয়ে আন্‌লে, তা কিছুই বুঝতে পারলেম না। দাদা! শেষটা কি ভূতে ধরলে? কি জানি বাবা। কিন্তু যাই বল দাদা, এর আশপাশে আরও বাড়ী ঘর আছে, আর মেয়ে মানুষও

চেয় আছে। দেখ্‌তে পাস্‌নে, এক একবার মিঠে গলায় উড়ো আওয়াজ এসে কাণে লাগে। বাবা, নির্ঘাত মেয়ে মানুষ আছে।"

যেদো বলিল,

"ভালো তারও যদি একটা আদটা ছটকে আসে, তা হলেও যে দিনটা কাটে যা হোক ক'রে। এ বাবা, মদ টুকু নাই, গাঁজা টুকু নাই, মেয়ে মানুষ টুকু নাই, কি করে থাকি বল দেখি।"

এইরূপ সময়ে সেই লৌহ দ্বার নিঃশব্দে উন্মুক্ত হইল এবং ধীরে ধীরে শান্তিদেবী সেই পথ মধ্য হইতে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র রামা যেদোর গা টিপিয়া বলিল,—

"ঐ রে! মা স্বরস্বতী আমাদের দুঃখু জান্‌তে পেরেছেন। কেয়াবাত কেয়াবাত, দেখেছিস্‌ একবার চেহারা খানা। এখন এক বোতল মাল পেলেই বশ— আছে।"

যেদো বলিল,—

"মা যখন দয়া করে মেয়ে মানুষ যুটিয়ে দিয়েছেন, তখন অব্যিশি মদও দেবেনই দেবেন। ছিঃ ভাই মেয়ে মানুষ, ওখানে থম্‌কে দাঁড়ালে কেন বাবা? এলে যদি ভাই দয়া করে, তো এই দিকে এগিয়ে এস।"

শান্তিদেবী নির্ভীকভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে

লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রেমো অস্ফুট স্বরে যেদোর কাণে কাণে বলিল,—

"না রে, কিছু বলিস্‌নে! দেখ্‌ছিস্‌ না, কেমন ঠাকুর দেবতার মত রকম সকম? কি জানি ভাই কি কর্ত্তে কি হবে! দেখ্‌না চেহারা! মান্‌ষের কি কখন অমন চেহারা হয়?"

যেদো ক্রুদ্ধস্বরে বলিল,—

"তুই যেমন মুখ্যু তেমনি তোর কথা। দেবতা বসে আছে তোর জন্যে। দেখ্‌না, দুশো ইয়ারকি দেবে এখন।"

পরে সেই দেবীর দিকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিল,—

"এস প্রাণ, এগিয়ে এস। ভয় কি ভাই, তোমাকে অযত্তন কর্‌তে আমাদের বাবারও সাধ্যি নাই।"

শান্তিদেবী ক্রমশঃ বর্ব্বরদ্বয়ের অতি নিকটাগতা হইলেন। তখন রামা ও যেদো কথা ভুলিয়া গেল, কামনা ভুলিয়া গেল এবং অভিসন্ধি ভুলিয়া গেল। তাহারা নির্নিমেষ লোচনে সেই অপার্থিব শ্রী, সেই অলৌকিক শোভা, সেই ভুবন-দুর্ল্লভ তেজঃপ্রভা সন্দর্শন করিতে লাগিল। শান্তিদেবী আরও নিকটস্থা হইলেন এবং যেদোর মস্তকে আপনার নিষ্পাপ কর-কমল প্রদান করিয়া, সস্নেহে জিজ্ঞাসিলেন,—

"এরূপে থাকিতে বড়ই কষ্ট হইতেছে কি বাছা?"

হায় হায় এমন আওয়াজও কি কখন মানুষের হয়! আনন্দ-সহকৃত করুণা সেই দেবীর সর্ব্বাঙ্গে মাখা। হরি হরি যেদো অবাক্! রামা হা করিয়া বহুক্ষণ সেই বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিল। তাহার পর, গল-বস্ত্র হইয়া সেই দেবীর চরণে প্রণাম করিয়া বলিল,—

"মা! তোমার ছেলের অপরাধ মাপ কর মা।"

শান্তিদেবী পরমাদরে তাহার হস্তধারণ করিয়া, বলিলেন,—

"ভয় কি বাবা, শ্যামসুন্দর অবশ্যই তোমাকে ক্ষমা করিবেন।"

কিন্তু যেদো এখনও কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ়। সে এখনও নির্নিমেষলোচনে সেই কলুষশূন্য অপরূপ শ্রী-সন্দর্শন করিতেছে। রামা তাহাকে ধাক্কা মারিয়া বলিল,—

"দেখ্‌ছিস্ না যেদো, সগ্‌গে থেকে মা ভগবতী নেমে এয়েছেন।"

তখন শান্তি বলিলেন,—

"না বাবা, আমি ভগবতী নহি। আমি তোমাদেরই মত মানুষ।"

এতক্ষণে যেদোর কথা কহিবার ক্ষমতা হইল। সে বলিল,—

"আমার মাথায় একটু পায়ের ধূলো দিয়ে আমাকে উদ্ধার কর মা।"

এই বলিয়া সে দেবীর পদস্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন,—

"না বাবা, আমার পদধূলি লইয়া কোন ফল নাই। স্বয়ং শ্যামসুন্দর তোমাকে এখনই উদ্ধার করিবেন।"

তখন যেদো বলিল,—

"কিন্তু মা আমি যে বড় পাপী। আমি কত মানুষের বুকে ছুরি মারিয়াছি; কত সতী সাবিত্রীর ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছি; কত চুরি করিয়াছি। মা, আমার পাপের তো সীমা নাই; আমার উপর কি তোমার দয়া হবে?"

শান্তিদেবী কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রামা বলিল,

"তা হউক মা, আমি যেদোর চেয়েও পাপী। আমার কোনই উপায় নাই। আমি টাকার লোভে সহোদর ভাইকেও মারিয়া ফেলিয়াছি। আমার হিসাবে যেদো দেবতা। মাগো আমার কি উপায় হবে?"

তখন শান্তিদেবী বলিলেন,—

"ভয় কি বাবা, শ্যামসুন্দর তোমাদের দুজনের উপরই দয়া করিবেন। তোমাদের কোন ভয় নাই, তিনি দয়া করিয়াছেন বলিয়াই তোমরা আপন আপন পাপের কথা এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছ। আর তোমাদের কোন ভয় নাই। এখন তোমাদের ভাল হবে।"

যেদো জিজ্ঞাসিল,—

"আমরা কি করিব? কোন্ উপায়ে আমাদের মঙ্গল হবে?"

শান্তি জিজ্ঞাসিলেন,—

"তোমরা কখন শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ দেখিয়াছ?"

উভয়েই উত্তর দিল,—

"ঢের—ঢের।"

শান্তি বলিলেন,

"বেশ। সেই মূর্ত্তি তোমরা এখন ভাবনা করিতে থাক। শিখি-পুচ্ছ-চূড়াধারী ত্রিভঙ্গিমঠাম শ্রীকৃষ্ণের রূপ তোমরা চিন্তা কর। যে যত অনন্যমনে সেই মূর্ত্তির চিন্তা করিতে পারিবে, তাহাকে ভগবান তত শীঘ্র উদ্ধার করিবেন। তোমরা তিন ঘণ্টাকাল এইরূপে চিন্তা কর। তাহার পর আবার আমি তোমাদের সহিত দেখা করিতে আসিব। তোমাদের যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা তোমরা তখন পাইবে।"

রামা বলিল,—

"যে আজ্ঞা।"

যেদো বলিল,—

"কিন্তু মা, তুমি যদি আসিতে ভুলিয়া যাও। আমরা যে বড় অভাগা।"

শান্তি বলিল,—

"না বাছা, তোমাদের কাছছাড়া হইলেও, আমি

কেবল তোমাদেরই কথা ভাবিব। তোমাদের কোন ভয় নাই ; কোন ভাবনা নাই।"

যেদো বলিল,—

"তবে একটু পায়ের ধূলো দিয়ে যাও মা।"

শান্তি বলিলেন,

"যদি তাহাতেই তোমাদের তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে লইতে পার।"

রামা বলিল,—

"খুব তৃপ্তি ; মা, আমরা আর কিছুই চাই না।"

তখন শান্তিদেবী উভয় হস্ত বক্ষে স্থাপন করিয়া বলিলেন,—

"শ্যামসুন্দর তোমাদের মতি ভাল করুন।"

তাহারা ভক্তিসহকারে দেবীর পদরজ লইয়া মস্তকে, ললাটে ও রসনায় সংলগ্ন করিল। ধীরে ধীরে শান্তি-দেবী প্রস্থান করিলেন। সেই লৌহদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন রামা বলিল,—

"ভাই, কি এ ?"

যেদো বলিল,—

"দেবতা আর কি ? দেখছিস্ না জায়গাটা যেন জ্বলে উঠেছিল, আর এখন একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল।"

তাহারা সবিস্ময়ে উভয়ে এই কাণ্ডের অনেক

আলোচনা করিল, কিন্তু কোন মীমাংসা হইল না। তাহার পর রামা বলিল,—

"যাই হোক বাবা, শেষ পর্য্যন্ত দেখা চাই।"

যেদো বলিল,—

"তবে যে রকম ভাবিতে বলিল, তাই ভাবিতে আরম্ভ কর।"

উভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল।—অল্পকাল পরেই, যেদো কি করিতেছে দেখিবার জন্য, রামা চক্ষু মেলিল। যেদোও সেই সময়ে, রামা কি করিতেছে দেখিবার জন্য চক্ষু মেলিয়া দেখিল, রামা চক্ষু মেলিয়া আছে। তখন যেদো বলিল,—

"দূর শালা, তুই বুঝি এই রকম করে ভাবছিস্?"

আবার উভয়ে পরামর্শ করিয়া, অধিকতর আগ্রহের সহিত ধ্যান করিতে বসিল। আবারও অনতিকাল মধ্যে তাহাদের ধ্যানভঙ্গ হইল। এইরূপ বারংবার চেষ্টার পর, তাহারা অপেক্ষাকৃত কৃতকার্য্য হইল।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৈকালে শান্তিধামের অপূর্ব্ব ভাব। তত্রত্য দেব-দেবীগণ, তখন পূর্ণানন্দিত মনে, ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন। সেই সুবিশাল পুরীর কোনস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছে। পুণ্যতেজঃ প্রদীপ্ত পাঠক, বেদীর উপর উপবেশন করিয়া, অনন্য মনে গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন; বহুতর দেবদেবী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, তদ্গত চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। কোথায় বা গীতার ব্যাখ্যা হইতেছে; কোথায় বা শ্যামসুন্দরের সেবার জন্য নানা-বিধ আয়োজন হইতেছে; কোথায় বা ধর্ম্মসঙ্গীত হইতেছে; কোথায় বা মীমাংসাকারী ব্যক্তি-বিশেষের নিকট যাহার যে সন্দেহ আছে, তিনি তাহা বুঝিয়া লইতেছেন। সর্ব্বত্র আনন্দ, পবিত্রতা, সরলতা ও শান্তি বিরাজ করিতেছে। এই পাপ-তাপ পূর্ণ ধরাধামে এতাদৃশ শান্তি নিকেতনের আবির্ভাব বস্তুতই বিধাতার বিশেষ করুণার পরিচায়ক।

সেই শান্তিধামের অপর এক দিকে এক সুবিস্তৃত পুষ্পকানন ছিল। তথায় অগণ্য ফুলের গাছে, অগণ্য ফুল ফুটিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। দেব-

দেবীগণ, ইচ্ছা হইলে, তথায় বিচরণ করেন; শ্যাম-সুন্দরের জন্য পুষ্পচয়ন করেন এবং তথায় কুঞ্জবিশেষে বা বেদী বিশেষে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান ও চিন্তা করেন। সেই বহুদূর ব্যাপী উদ্যান মধ্যে, স্থানে স্থানে বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদির সংমিশ্রণে ঘনারণ্য রচিত হইয়াছে। সেই অরণ্যাভ্যন্তরে স্থানে স্থানে অতি সুপরিষ্কৃত ও সুরম্য স্থান আছে। আবশ্যক হইলে, তথায় সমুপবিষ্ট হইয়া, দেবদেবীগণ একান্ত মনে অভীষ্ট দেবতার ধ্যান করিতে পারেন।

শান্তি-কাননের একতম নিভৃত কুঞ্জে সম্প্রতি জ্ঞানানন্দ যোগী উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার তেজঃপ্রভাবশালী সুদীর্ঘ কলেবর ও প্রশান্ত নয়ন-শ্রী সন্দর্শন করিলে, স্বতঃই, হৃদয় হইতে তাঁহার প্রতি ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত হইয়া, তদীয় চরণ ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়াই বিশ্বাস হয়।

ধীরে ধীরে, তেজঃ ও জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে করিতে, শান্তিদেবী সেই স্থানে সমাগতা হইলেন এবং আন্তরিক ভক্তি সহকারে সেই দেব-চরণে প্রণাম করিয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্র জ্ঞানানন্দ মনে মনে বলিলেন,—'প্রণাম করিও না, কর। তোমার প্রণাম গ্রহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি আমি নহি। তোমার স্নেহেরও যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়াছে। কিন্তু আরও

পরীক্ষা বাকী আছে। ক্রমশঃ তাহায় ব্যবস্থা হইবে। আপাততঃ তোমাকে কি আশীর্ব্বাদ করিব? তোমার কি নাই? প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"শ্যামসুন্দর তোমার মঙ্গল করুন। বৎসে! আমাকে সত্বর ভিক্ষায় যাত্রা করিতে হইবে। তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

শান্তি বলিবেন,—

"প্রভুর ইচ্ছা।"

"তবে, এখানে যদি তোমার কোন অসমাপিত কার্য্য থাকে, তাহা শেষ করিয়া রাখ।"

শান্তি হাসিয়া বলিলেন,—

"প্রভো! এ সংসারে আমার কার্য্য কিছুই নাই। যাহা কিছু আমাকে আপনি করান, তাহাই আমি করি। সকলই প্রভুর কার্য্য। আর কার্য্য সমাপিত কিসে হয় তাহাও তো জানি না প্রভু। কার্য্য অনন্ত—সীমা-রহিত, তাহার আরম্ভ বা শেষ কোথায়? তবে ভগ-বন্! কার্য্য শেষ করিতে আদেশ করিতেছেন কেন?"

জ্ঞানানন্দ মনে মনে বলিলেন,—'কোন্ ভাগ্যবলে—পূর্ব্ব জন্মের কোন্ অসাধারণ সুকৃতিফলে এরূপ শিষ্যাকে উপদেশ দিবার ভার আমার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল? সার্থক আমার সাধনা।' প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"যে দুই কলুষিত পুরুষের সহিত তোমাকে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলাম, তাহা করিয়াছ কি ?"

শান্তি বলিলেন,—

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তাহারা বোধ করি তোমার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিল ?"

শান্তি আবার হাসিয়া বলিলেন,—

"প্রভো! আমি কে যে তাহারা আমার উপর অত্যাচার করিবে। প্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতে যদি কখন আমার অক্ষমতা হয়, তখন হয় তো আমি কীটের অপেক্ষা হেয় ও সর্ব্ব লোকের পাদ-পেষণোপযোগী হইব। কিন্তু যতক্ষণ আমি অনন্য মনে প্রভুর ঐ চরণ যুগলের ধ্যান করিতে সমর্থ, ততক্ষণ আমার স্বতন্ত্রতা আমি অনুভব করি না, সুতরাং আমি থাকি না। তখন অত্যাচার ও শিষ্টাচার, তিরস্কার ও পুরস্কার, পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, জ্ঞান ও অজ্ঞান, প্রেম ও হিংসা কিছুই আমি বুঝিতে পারি না। প্রভু, আপনি দেবতা ও ভগবান্, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বব্যাপী। যে ব্যক্তি ভাগ্যবলে আপনার শিষ্যত্ব লাভ করিয়া পুনর্জন্ম ও নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার হৃদয়ভাব ও অবস্থার কথা প্রভুর অপরিজ্ঞাত থাকা কদাপি সম্ভবপর নহে! তবে প্রভো! এরূপ আদেশ কেন করিতেছেন ?"

জ্ঞানানন্দ বলিলেন,—

"তবে তাহারা কোন অত্যাচার করে নাই? ভাল ভাল। তাহাদের কোন হিত পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে?"

শান্তি বলিলেন,—

"প্রভুর আজ্ঞা পাইলে, তাহাদিগকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করি।"

"এখনই?"

"যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়।"

"আজি তোমার ইচ্ছাই তোমার গুরুর ইচ্ছা।"

শান্তি আবার হাসিয়া বলিলেন,—

"কিন্তু আমার ইচ্ছা করায় কে?"

শান্তি চলিয়া গেলেন। জ্ঞানানন্দ মনে মনে বলিলেন—'ধরা পবিত্র হইল। এ দেবী যখন বসুধায় বিচরণশীলা তখন ইহা পুণ্যভূমি। ঐ দেবীর প্রতিপাদ-বিক্ষেপে ধরণীর কলেবর পুলকিত হইতেছে।' জ্ঞানানন্দ প্রেমাবেশে ধ্যান-মগ্ন হইলেন। তাঁহার দেহ তপ্তকাঞ্চন সন্নিভ হইল; অপার্থিব শোভা তাঁহার সমস্ত কলেবর সমাচ্ছন্ন করিল; তাঁহার দেহ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

এইরূপ সময়ে রামা ও যেদোকে সঙ্গে লইয়া শান্তি-দেবী পুনরায় সেই কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু

একি ব্যাপার! রামা ও যেদো উভয়েরই নয়ন হইতে প্রেমবারি বিগলিত হইতেছে; উভয়েই আনন্দে পুলকিত। এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদ্বয়, সেই ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষের সম্মুখীন হইয়া এবং তদীয় অলৌকিক শ্রী দেখিয়া অবাক্ হইল। শান্তিদেবী তাহাদিগকে সঙ্কেতে সেই মহাপুরুষকে প্রণাম করিতে উপদেশ দিলেন। তাহারা উভয়ে ভূ-পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। প্রণামান্তে যখন তাহারা গাত্রোত্থান করিল, তখন তাহাদের আর এক ভাব হইল। তখন তাহাদের নয়নজল নিবারিত হইল, অভাব বোধ বিদূরিত হইল, সন্তোষে দেহ মন পরিপূর্ণ হইল এবং তাহারা আনন্দে মগ্ন হইল।

সেই সময়ে সেই ধ্যান-নিরত সাধু নয়ন উন্মীলন করিলেন এবং সেই সর্ব্বদর্শী নয়নের প্রশান্ত দৃষ্টি সেই দুই ব্যক্তির উপর পতিত হইল। তখনই তাহাদের প্রাণের পূর্ণ তৃপ্তি হইল এবং তাহারা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়া কৃতার্থ হইল। তখন মহাপুরুষ বলিলেন,—

"শুনিয়াছি তোমরা এই স্থানে আসিয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছ এবং এখানে থাকা তোমরা অতিশয় কষ্টকর বলিয়া মনে করিয়াছ।"

ভাষা আর তখন তাহাদের ভাব প্রকাশের ব্যাঘাত করে না। রামা বলিল,—

"দেবতা, অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমরা

যতক্ষণ স্বর্গসুখ জানিতে পারি নাই, ততক্ষণ ব্যাকুল ছিলাম।"

যেদো বলিল,—

"দয়াময়! আমাদের আর কোন কষ্ট নাই। আমরা এ স্বর্গ হইতে আর কোথাও যাইব না। আমরা এত দিন নরকে ছিলাম। এই মা আমাদের স্বর্গে আনিয়াছেন। ঐ চরণ হইতে আমরা আর কোথাও যাইব না।"

যেদো ক্ষান্ত হইলে, রামা শান্তির দিকে চাহিয়া বলিল,—

"মা! এ অধম ছেলেদের তুমি কি কাছে থাকিতে দিবে না? তোমার আশীর্ব্বাদবলে আমরা ধ্যান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ওঃ সে শোভার কথা কি বলিব? এখান হইতে যদি তুমি আমাদের তাড়াইয়া দেও, তবে আর আমরা তোমাকে দেখিতে পাইব না। তোমাকে না দেখিলে শ্রীকৃষ্ণও দেখা দিবেন না। তাহা হইলে আমাদের মরণ হইবে। আমরা তোমার কাছছাড়া হইয়া কোথাও যাইব না।"

যেদো বলিল,—

"মা, ইনিই কি নারায়ণ? আমরা যে দেবতাকে দেখিয়াছি, তাঁহার রূপ স্বতন্ত্র; কিন্তু শ্রী এমনই। মা, ইনি তো দয়াময়! তবে আমরা তোমার কাছে থাকিতে পাইব না কেন?"

তখন মহাপুরুষ বলিলেন,—

"বৎস! তোমাদের যিনি মা, উনি তোমাদেরও মা, আমারও মা। উনিই এ স্বর্গধামের অধিষ্ঠাত্রী। উহাকে শান্তিদেবী বলে। এই জন্য এই স্থানের নাম শান্তিনিকেতন। তোমরা কায়মনোবাক্যে ঐ দেবীর চরণে মন স্থাপন করিয়া, উহার আজ্ঞার বশবর্ত্তী থাকিও তাহা হইলেই তোমাদের সকল কামনা পূরণ হইবে। তোমরা অবশ্যই এখানে থাকিতে পাইবে। মার ছেলে কি মার কাছছাড়া হয়? এখন হইতে তোমাদের নূতন নাম হইবে।"

যতক্ষণ মহাপুরুষ এই সকল কথা বলিতেছিলেন, ততক্ষণ শান্তিদেবী নয়ন মুদিয়া কেবল প্রভুরই পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছিলেন।

তদন্তর মহাপুরুষ রামার হস্ত ধারণ করিয়া এবং তত্রত্য একটু মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া, তাহার কপালে তিলক করিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—

"আজি হইতে তোমার নাম হইল, 'অভিরাম'।"

অনন্তর যেদোর হস্ত ধারণ করিয়া, সেইরূপ অনুষ্ঠানান্তে, বলিলেন,—

"আজি হইতে তোমার নাম হইল, 'নারায়ণ'।"

মহাপুরুষের করস্পর্শ হওয়ায়, অভিরাম ও নারায়ণের শরীর দিয়া অলৌকিক ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব তাড়িত-প্রবাহ

প্রবাহিত হইতে থাকিল। তাহারা চলচ্ছক্তিহীন বাক্‌-শক্তিহীন ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল। মহাপুরুষ বলিলেন,—

"মা তোমার নূতন সন্তানদের লইয়া যাও। ইহাদের আশ্রম নির্দ্দেশ করিয়া দেও। অন্ত ভগবানের সহিত ইহা-দের পরিচয় করাইয়া দিও।"

শান্তিদেবী, উভয় হস্তে উভয় সন্তানের হস্ত ধারণ করিয়া, ভক্তিসহকারে মহাপুরুষকে প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ হাসিয়া বলিলেন,—

"শান্তিনিকেতনে যাও কখন কখন ছেলেকে প্রণাম করেন।"

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা সময়ে শান্তি নিকেতনের আর এক ভাব। তত্রত্য দেবদেবীগণ তখন শ্যামসুন্দরের আরতির জন্য বড়ই ব্যস্ত। কেহ মালা গাঁথিতেছেন, কেহ পুষ্প সাজাইতেছেন, কেহ ভোগের আয়োজন করিতেছেন, কেহ চন্দন প্রস্তুত করিতেছেন, কেহ দেব-ব্যবহার্য্য রজত ও স্বর্ণপাত্রসমূহ পরিষ্কার করিতেছেন, কেহ নিকেতনের নির্দ্দিষ্ট স্থান সমূহে আলোক প্রদানের ব্যবস্থা করিতেছেন, কেহ দেবালয় মার্জ্জনা করিতেছেন ইত্যাদি নানাবিধ কার্য্যে সকলেই ব্যস্ত।

ক্রমে সায়ংকাল সমুপস্থিত হইল এবং আরতির সমস্ত আয়োজন হইল। তখন মধুর মৃদঙ্গ, দামামা ও করতালাদির বাদ্যারম্ভ হইল! সে বাদ্যধ্বনি ও তাহার প্রতিধ্বনিতে সেই সুপ্রশস্ত হর্ম্ম্য ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য আমোদিত হইয়া উঠিল। আশ্রমবাসী নরনারীগণ যিনি যেখানে ছিলেন, সকলে আসিয়া দেবালয়ে সমবেত হইতে লাগিল।

তখন অগ্রে মহাপুরুষ জ্ঞানানন্দ, পশ্চাতে অভিরাম ও নারায়ণ এবং সর্ব্বশেষে শান্তিদেবী সেই দেবালয়ে আগ-

মন করিলেন। মহাপুরুষকে দর্শনমাত্র তাবতেই ভক্তি-ভাবে প্রণাম করিয়া, তাঁহার চরণরজঃ মস্তকে ধারণ করিতে থাকিলেন। মহাপুরুষ নয়ন মুদ্রিত করিয়া, করযোড় করিয়া রহিলেন। মহাপুরুষের সমাগমে সকলের হৃদয় দিয়া আনন্দলহরী প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রশান্ত সহাস্য বদন, তেজঃ-প্রদীপ্ত কলেবর, অপরূপ শ্রী দর্শনে সকলেই পরম পুলকিত হইলেন।

শান্তি দেবীকেও সকলে আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম করিতে থাকিলেন। তিনিও মহাপুরুষের ন্যায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া, প্রভুর পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। আনন্দ ও শোভা বিলাইতে বিলাইতে তিনি মহাপুরুষের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। আর অভিরাম ও নারায়ণ কি করিলেন? তাঁহারা প্রথমে অবাক্ হইলেন। এত দেবদেবীর সুললিত পুণ্য-প্রদীপ্ত কলেবর দর্শন করিয়া, সুরভি কুসুম ও চন্দনাদির গন্ধ উপভোগ করিয়া, বাদ্যধ্বনির গাম্ভীর্য্য অনুভব করিয়া, ভক্তি ও আনন্দের অদ্ভুত বিকাশ দেখিয়া, পবিত্রতা ও পুণ্যের সমীরণ সম্ভোগ করিয়া, তাঁহাদের মনে হইল, তাঁহারা সশরীরে স্বর্গে আগমন করিয়াছেন। তখন তাঁহারা কিয়ৎকাল কিঙ্কর্ত্তব্য-বিমূঢ় থাকার পর, উন্মত্ত ভাবে সেই সকল দেবদেবীর চরণমূলে নিপতিত হইতে লাগিলেন এবং তত্রত্য পবিত্র রজঃ স্ব স্ব কলেবরে সম্পৃক্ত করিতে থাকিলেন।

আরতি আরম্ভ হইল; মহাপুরুষ স্বয়ং সেই সুবৃহৎ পঞ্চপ্রদীপ হস্তে লইয়া দেবারতি করিতে আরম্ভ করিলেন। হুলুধ্বনি, আনন্দধ্বনি ও বাদ্যধ্বনিতে দিগ্বলয় সম্পূরিত হইয়া উঠিল। আরতি সমাপ্ত হইলে, সেই দেবদেবীগণ বিগ্রহমঞ্চ বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। অহো কি অপূর্ব্ব! কি সুললিত! কি অলৌকিক! আহা! সে নৃত্য—সে প্রেমোন্মাদপূর্ণ অপূর্ব্ব পাদবিক্ষেপ—সে সুপবিত্র অঙ্গভঙ্গি, তাহার কি বর্ণনা সম্ভবে? হরি হে! হে পুরুষোত্তম! কত দিনে বসুন্ধরার তাবতে এরূপ স্বর্গসুখ সম্ভোগের অধিকারী হইবে? কতদিনে মানব, ভক্তি মাহাত্ম্যে বিমোহিত হইয়া, তোমার জন্য এইরূপ উন্মত্ত হইবে? কত দিনে, হে জগন্নাথ! তোমার মহিমা হৃদ্গত করিয়া জীব ধন্য হইবে?

সেই নৃত্যামোদ ক্ষান্ত হইলে, দেবদেবীগণ সমস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সেই সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূত ধন্য হইতে লাগিল।

তাঁহারা গান করিতেছেন,—

"প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্র চরিত্রমখেদং
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।

ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধারণকিণচক্রগরিষ্ঠে
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর
জয় জগদীশ হরে।

বসতি দশনশিখরে ধরণীতব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না
কেশব ধৃতশূলকররূপ
জয় জগদীশ হরে।

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিত হিরণ্যকশিপুতনু-ভৃঙ্গং
কেশব ধৃতনরসিংহরূপ
জয় জগদীশ হরে।

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন
কেশব ধৃতবামনরূপ
জয় জগদীশ হরে।

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগত পাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভবতাপং

কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ
জয় জগদীশ হরে।
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ং
কেশব ধৃতরামশরীর
জয় জগদীশ হরে।
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং
কেশব ধৃতহলধররূপ
জয় জগদীশ হরে।
নিন্দসি-যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।
ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং
কেশব ধৃত কল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে।”

সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে মহাপুরুষ প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য দেবদেবীগণ, প্রথমতঃ সাষ্টাঙ্গে বিগ্রহ যুগলকে প্রণাম করিয়া, তদনন্তর শান্তিদেবীকে প্রণাম করিয়া, একে একে প্রস্থান করিলেন। কেবল শান্তি, অভিরাম ও নারায়ণ হরিমন্দিরে অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন।

অদ্য মহাপুরুষের আজ্ঞানুসারে, শান্তিদেবী অভিরাম ও নারায়ণকে শ্যামসুন্দরের সহিত পরিচিত করাইবেন।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রমাপতি বাবু তীর্থ যাত্রা করিবেন। আয়োজনের সীমা নাই। লোকজন দাসদাসী, অনেকেই যাইবে। আর যাইবেন, তাঁহার দেওয়ান বিহারীলাল মিত্র। দ্রব্য সামগ্রী প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে সঙ্গে যাইবে। বিহারী বাবু অতি বাল্যকাল হইতেই পিতৃমাতৃহীন এবং দয়াবান রাধানাথ বাবুর সংসারে প্রতিপালিত। প্রথমে তিনি রাধানাথ বাবুর জমদারী সংক্রান্ত সামান্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং ক্রমশঃ, বিদ্যা বুদ্ধির আতিশয্য হেতু, জমীদারীর একজন অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারী হইয়া উঠেন। নৌকা-ডুবির পর, রমাপতি বাবু রাধানাথের আশ্রয়ে আসিলে, যে সকল ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিশেষ আত্মীয়তা হয়, তন্মধ্যে এই বিহারীলাল বাবু সর্ব্ব প্রধান। বিহারী সেই অবধি রমাপতির অভিন্নহৃদয় বান্ধব। এই বিপুল সম্পত্তি রমাপতি বাবুর হস্তগত হওয়ার পর হইতে, তিনি বিহারীর মন্ত্রণা ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মই করেন না। পরিশেষে দেওয়ানের পদ শূন্য হইলে, তিনি বিহারী বাবুকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিহারীর কার্য্যদক্ষতা অসাধারণ। অতি যোগ্যতার সহিত তিনি কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছেন।

বিহারী বাবু, দাসদাসী সকাশে, প্রভু পরিবারভুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে সম্মানিত ও সমাদৃত। শিশুকাল হইতেই এই পরিবার মধ্যে অবস্থান করায়, সকলেই তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়া বিশ্বাস করে। সুরবালা তাঁহাকে দাদা বলিয়া থাকেন। মাধুরী ও খোকা তাঁহাকে মামা বলিয়া ডাকে এবং রমাপতি তাঁহাকে ভাই বলেন। পুরমধ্যে কোন স্থানেই বিহারী বাবুর গমনাগমনের বাধা নাই। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বত্র সম্মানিত। বিহারী বাবু বলিয়াছেন শুনিলে, কোন বিষয়ে সুরবালা আর প্রতিবাদ করেন না এবং রমাপতি বাবুও তাহাই মানিয়া লন।

কিন্তু মনুষ্যের মন বড়ই দুর্জ্ঞেয়। বহিরাবরণ দেখিয়া মনুষ্যের হৃদয়ের বিচার হয় না। কাজ দেখিয়া প্রাণের ভাব অনুমান করা যায় না। রমাপতির এই পরমাত্মীয় ও প্রাণের বন্ধু, অন্তরে তাঁহার প্রবল শত্রু। রমাপতি সম্প্রতি মরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং চিকিৎসকেরাও তাঁহার জীবন রক্ষার সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছিলেন, তখন বাহ্যতঃ বিহারী বাবুর উদ্বেগের সীমা ছিল না সত্য; কিন্তু যদি কেহ তৎকালে তাঁহার অন্তর অনুসন্ধান করিতে পারিত, তাহা হইলে জানিতে পারিত যে, তাঁহার অন্তরে তৎসময়ে আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি কায়মনোবাক্যে তৎকালে রমাপতির মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন।

কেন তাঁহার চিত্ত এরূপ ভাবনাপন্ন, তাহা ক্রমশঃ পরীক্ষিতব্য।

আপাততঃ রমাপতি, সুরবালা, মাধুরী, খোকা, বিহারী বাবু ও আবশ্যকমত দাসদাসী মিলিত হইয়া তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা করিবেন। আয়োজন সমস্তই ঠিক হইয়াছে। হাবড়া ষ্টেশনে গাড়িও রিজার্ভ করা হইয়াছে।

রমাপতি বাবু আর পূর্ব্বের মত অপ্রফুল্ল ও কাতর নহেন। তিনি তিন চারি বার সুকুমারীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। সুকুমারীর সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে। সেই দেবী আবারও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দর্শন দিবেন স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং রমাপতি ও সুরবালা সম্পূর্ণরূপে সুখী হইয়াছেন। যে দারুণ দুঃখভার তাঁহাদিগকে পোষিত করিতেছিল, তাহা অন্তরিত হইয়াছে। সুকুমারী যাহাতে তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইতে না পারেন, তজ্জন্য রমাপতি ও সুরবালা বিশেষ প্রযত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সে যত্ন সফল হয় নাই। সুকুমারী কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি মিনতি করিয়া, রমাপতি ও সুরবালাকে তৎসম্বন্ধে তাঁহার অক্ষমতার কথা জানাইয়াছেন। অতঃপর তিনি সতত তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন আশ্বাস দেওয়ায় অগত্যা তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে হইয়াছে।

সুকুমারীর বর্ত্তমান নিবাস কোথায়, তাঁহার উপ-জিবীকা কি, তাঁহার রক্ষক কে ইত্যাদি বিষয়ে সুরবালা ও রমাপতি বিশেষ কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তরে, সুকুমারী কেবল ভগবানেরই নাম করিয়াছেন। সুরবালা স্থির করিয়াছেন, তাঁহার সেই সপত্নী, জলমগ্ন হওয়ার পর হইতে, কোন অনৈসর্গিক উপায়ে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন; নহিলে এত রূপ, এমন কথা, এত ক্ষমতা কি আর মানুষের হয়? সুতরাং দেব দর্শন হইয়াছে এবং দেবতার সহিত পরিচয় হইয়াছে মনে করিয়া, তাঁহার আনন্দ ও সন্তোষের সীমা নাই। রমাপতি বাবু স্থির করিয়াছেন, তাঁহার সেই পত্নী, কোন অসম্ভাবিত উপায়ে, অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি চিরকালই দেবতুল্য ছিল। অধুনা তাঁহার অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহার যে সুকুমারী ছিলেন, তিনি লোকান্তরিত হইয়া, দেবক্ষমতা ও দেব-কান্তি লাভ করিয়াছেন এবং লীলা প্রকাশের নিমিত্ত পুনরায় ভূতলে আবির্ভূতা হইয়াছেন। যাহাই হউক, তাঁহারা সুখী হইয়াছেন।

এইরূপ অবস্থাপন্ন রমাপতি ও সুরবালা নিয়মিত দিনে পরমানন্দে রেল যোগে তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। বাষ্পীয় শকট এই সকল আনন্দপূর্ণ ব্যক্তিকে বহন করিয়া, বায়ুবেগে প্রধাবিত হইল। কত বন, কত কানন, কত

জলাশয়, কত প্রান্তর, কত পল্লী, কত ধান্যক্ষেত্র তাঁহাদের নয়ন-সমক্ষে নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল। কতই জনতা, কতই ব্যস্ততা, কতই উৎসাহ তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। মাধুরী ও খোকা গজর গজর করিতে করিতে, কতই কি বকিতে থাকিল; আর সুরবালা, ঈষৎ হাসির সহিত মিশাইয়া, কত কথাই রমাপতি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুরবালা বড়ই আনন্দ লাভ করিতেছেন জানিয়া, রমাপতি মনে করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার এ আয়োজন ও প্রযত্ন সম্পূর্ণরূপ সফল হইয়াছে।

গাড়ি বর্দ্ধমান ছাড়িয়া, ক্রমশঃ কর্ড লাইনে প্রবেশ করিল এবং উপন্যাসবর্ণিত দৈত্যের ন্যায় হুঙ্কার ত্যাগ করিতে করিতে, তরঙ্গায়িত বন্ধুর প্রদেশে ও পরম রমণীয় দৃশ্যাবলীর মধ্যে ধাবিত হইল। মেঘ-মালার ন্যায় পাহাড় শ্রেণীর দূরাগত অপূর্ব্ব শ্রী এবং শাল ও পলাশ বনের অপরূপ শোভা রমাপতি ও সুরবালাকে বিনোদিত করিতে থাকিল। কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অতি অল্প জলবিশিষ্ট, স্রোতস্বতী নদী, তাঁহাদিগের প্রীতি সঞ্চার করিতে লাগিল। কল্যাণেশ্বরী দর্শনার্থ তাঁহারা প্রথমে বরাকরে অবতীর্ণ হইলেন। বরাকর পাথুরিয়া কয়লার ধূলায় আবৃত, এজন্য গ্রাম হইতে কিঞ্চিদ্দূরে তাঁহাদের বাসা স্থির ছিল। তাঁহারা সেই বাসায় অধিষ্ঠিত হইয়া স্বচ্ছন্দে রাত্রিপাত করিলেন।

পরদিন প্রাতে সকলে মিলিয়া কল্যাণেশ্বরী দর্শনে যাত্রা করিলেন। সেই অরণ্য ও পাহাড় বেষ্টিত দেব-স্থানের গম্ভীর শ্রী সন্দর্শনে তাঁহাদের হৃদয় নিতান্ত পুলকিত হইল। তাঁহারা ভক্তিভাবে দেব-পূজা সমাপন করিয়া, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আবাসে প্রত্যাগত হইলেন। প্রত্যাগমন কালে পঞ্চকোটের সুবিস্তৃত শৈলমালা তাঁহাদিগের নয়ন-মনকে বিমোহিত করিতে থাকিল।

কল্যাণেশ্বরী সন্নিহিত স্থান সমূহ রমাপতিকে এতই বিমোহিত করিয়াছিল যে, তিনি পুনরায় পরদিন তদ্দর্শনে যাত্রা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অদ্য তিনি সুরবালা, মাধুরী বা খোকাকে সঙ্গে লইলেন না; তাঁহারাও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন বলিয়া, পুনরায় রমাপতির সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

বিহারী বাবুও, শারীরিক অসুস্থতার কারণে, রমাপতির সঙ্গে যাইবেন না স্থির হইল। বিশেষতঃ সুরবালা যখন বাসায় থাকিতেছেন, তখন তাঁহার রক্ষক স্বরূপে বাসায় থাকা বিহারী বাবুর পক্ষে আবশ্যক বলিয়া স্থির হইল। কেবল একজন পাচক, দুইজন দাসী, বিহারী বাবু, সুরবালা ও তাঁহার সন্তানদ্বয় বাসায় থাকিলেন। দ্বারবান্ ভৃত্যাদি তাবতেই রমাপতি বাবুর সঙ্গে গেল। বাসায় যখন বিহারী বাবু থাকিলেন, তখন আর কাহারও থাকিবার বিশেষ প্রয়োজন কেহই অনুভব করিলেন না।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দুই জন ঝি, মাধুরী ও খোকাকে লইয়া, সেই সুবৃহৎ বাসার পুষ্পোদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছে। বিহারী বাবু তাহাদের নিকটস্থ হইয়া মাধুরী ও খোকার সহিত অনেকক্ষণ নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিলেন। তাহারাও মামা বাবুর সহিত ছুটাছুটী করিয়া অনেক খেলা করিল। সুরবালা তখন এক প্রকোষ্ঠের বাতায়ন সমীপে একখানি বই লইয়া উপবিষ্টা। পুস্তকে তাঁহার মন নাই; মাধুরী ও খোকা বিহারী বাবুর সঙ্গে যে অপূর্ব্ব খেলা করিতেছে, তাহাই দেখিতে তিনি নিবিষ্ট-চিত্ত বিহারীবাবু, মাধুরী ও খোকার গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া, ঝিদের বলিলেন,—

"তোরা আজি মাধু ও খোকাকে বরাকর নদীতে স্নান করাইয়া আন। এমন পরিষ্কার স্বাস্থ্যকর জল আর এদিকে নাই। উহাদের গায়ে অনেক ময়লা হইয়াছে। বেশ করিয়া স্নান করাইয়া আনি দেখি। দূর তো বেশী নয়। যা, গিন্নিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আয়।"

তাহারা মাধুরী ও খোকাকে লইয়া সুরবালার

নিকটস্থ হইল। সুরবালা বিহারী বাবুর উপদেশ স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন: সুতরাং ঝিরা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,—

"দাদা যখন বলিতেছেন, তখন আর আমি কি বলিব? তাই নিয়ে যাও।"

অনতিকাল মধ্যে, ফুলেল তেল, তোয়ালিয়া, সাবান, এবং কাপড় চোপড় লইয়া ঝিরা মাধুরী ও খোকাকে স্নান করাইতে চলিল। পাচক, দূরে পাকশালায় স্বকার্য্যে নিযুক্ত আছে। বলিতে গেলে বিহারী বাবু ও সুরবালা ভিন্ন, বাসায় আর কেহ থাকিল না।

তখন বিহারী বাবু মনে করিলেন,—'এমন সুযোগ আর কখনই হইবে না। দ্বাদশ বৎসর যে বাসনা আমাকে দগ্ধ করিতেছে, আজি তাহা মিটাইবার সুন্দর অবসর উপস্থিত। এমন সময় আর জীবনে পাইব না। অনেক চেষ্টা করিয়াছি, এ পাপ বাসনা নিবারণ করিতে পারি নাই। না, সে চেষ্টা অসম্ভব। যদি ইহা পাপ কার্য্য হয়, তাহা হইলে আমাকে পাপী হইতেই হইবে। পাপ হউক, দুষ্কর্ম্ম হউক, নরক হউক এ বাসনা দমিত হইবার নহে। অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে; আমি আজিই মনের বাসনা মিটাইব।"

তখন বিহারী বাবুর মূর্ত্তি অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল এবং মুখের ভাব

করুণাশূন্য হইল। তিনি তখন ধীরে ধীরে সুরবালার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র সুরবালা ভয়-চকিত ভাবে বলিলেন,—

"দাদা! একি! তোমার চেহারা এমন হইয়াছে কেন? তোমার কি অসুখ হইয়াছে?"

বিহারী বাবু বলিলেন,—

"অসুখ—ওঃ তাহার কথা আর কি বলিব! অতি ভয়ানক অসুখ! আমার মন প্রাণ দগ্ধ করিতেছে। তোমার করুণা ভিন্ন সে অসুখ নিবারণের আর কোনই ঔষধ নাই। আজি তুমি আমাকে রক্ষা কর—আমার প্রাণ যায়।"

তখন সেই সুরসুন্দরী যুবতী নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে, বলিলেন,—

"বল, বল দাদা, আমায় কি করিতে হইবে। তোমার অসুখ শান্তির নিমিত্ত যাহা করা আবশ্যক আমি তাহাই করিব।"

বিহারী বলিলেন,—

"শুন সুরবালা! বাল্যকালের কথা তোমার মনে পড়ে কি? বাল্যকালে তোমাতে আমাতে একত্র খেলা করিতাম। তখন হইতে এ অভাগা নিরন্তর তোমার সঙ্গেই আছে। তখন হইতে তোমার এ দাস নিয়ত তোমার পূজা করিয়া আসিতেছে। আমি যদি ব্রাহ্মণ হইতাম, তোমার পিতা, তাহা হইলে, এই অধমের

সহিতই তোমার বিবাহ দিতেন। কিন্তু আমার কপাল মন্দ, তাই আমার প্রাপ্যবস্তু অপরে লাভ করিয়াছে। কিন্তু সুরবালা! তুমি অপরের অঙ্কশায়িনীই হও, আর তোমার যেরূপ মনের ভাবই হউক, তোমার লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমাকে আমিও যেমন ভাল বাসি তুমিও আমাকে তেমনই ভাল বাস। অতএব তুমি যাহারই হও, তোমার প্রেম আমিই লাভ করিব। প্রকাশ্যরূপে না হইলেও, গোপনে তোমার প্রেম আমিই ভোগ করিব কিন্তু আমার সে আশায় ছাই পড়িয়াছে। অতএব আমি এখন অসদুপায়ে তোমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। সুন্দরি! এ লোভ আমার পক্ষে অসংবরণীয়; সুতরাং আমি জ্ঞান-শূন্য। আমি মরণাপন্ন। সুরবালা! তুমি আজি আমাকে রক্ষা কর।"

সুরবালার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তিনি নিতান্ত ভীতভাবে বলিলেন,

"দাদা! দাদা! সহসা তোমার একি মতিভ্রম হইল? যদি তুমি আমাকে এক তিলও ভালবাসিতে, তাহা হইলে এরূপ চিন্তা কদাপি তোমার মনে উদিত হইত না। আমি তোমাকে সহোদর বলিয়াই জানি। তোমার এ মতিভ্রমের কথা শুনিয়া, আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইতেছি।

যাও তুমি; নির্জ্জনে বসিয়া ভগবানের ধ্যান কর গিয়া। তাহা হইলে, তোমার এ দুশ্চিন্তা দূর হইবে।”

তখন সেই নর-প্রেত হাসিয়া বলিল,—

“ভগবান্ আমার প্রতি সদয় হইলে, তোমার মনও আমারই মত হইত। শুন সুরবালা! যদি তুমি সহজে আমার বাসনা নিবৃত্তির উপায় করিয়া না দেও, তাহা হইলে, আমি বল প্রয়োগ দ্বারা আমার বাসনা পূরণ করিব। যদি এখন স্বয়ং ভগবান স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আমাকে নিরস্ত হইতে উপদেশ দেন, তাহাও আমি শুনিব না। বারো বৎসরের চেষ্টায় যে সুযোগ আজি আমি লাভ করিয়াছি, তাহা কদাপি পরিত্যাগ করিব না।”

এই বলিয়া সেই পশু তখন সুরবালার নিকটস্থ হইল। সুরবালা সভয়ে দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া, সে ব্যস্ততা সহ দ্বার রুদ্ধ করিল; তাহার পর বলিল,—

“এখনও বলিতেছি, সুরবালা, যদি তুমি স্বেচ্ছায় আমার এই লোলুপ হৃদয়কে শীতল করিতে সম্মত না হও, যদি তুমি আবার এই মত্ততা দেখিয়া দয়ার্দ্র না হও, তাহা হইলে আমি বলপূর্ব্বক তোমাকে আমার আয়ত্তাধীন করিব। আমার শরীরে এখন আসুরিক বল! কাহার সাধ্য আমাকে নিরস্ত করে?”

তখন রোষকষায়িত-লোচনা সুরবালা বলিলেন,—

'পাষণ্ড, নরাধম! তুই, নিরাশ্রয় অবস্থা হইতে, আমার পিতৃ-অন্নে পালিত হইয়া আমার স্বামীর অকৃত্রিম বন্ধুরূপে পরিগণিত হইয়া, আজি বিশ্বাসের এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিতেছিস্? ধর্ম্ম, লোকলজ্জা, কৃতজ্ঞতা সকলই তুই আজি বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিস্। স্বামী ভিন্ন আমার আর দেবতা নাই; আমি স্বামী ভিন্ন অন্য দেবতার কখন পূজা করি নাই। সেই সাক্ষাৎ সজীব দেবতার চরণে যদি আমার একান্ত মতি থাকে, তাহা হইলে, তোর মত শত শত নর-প্রেত একত্র হইলেও আমাকে কলুষিত করিতে পারিবে না!"

সেই পতি-প্রেম পরায়ণা সুন্দরী-শিরোমণি ভিত্তিতে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া রহিলেন। তাঁহার তদানীন্তন শোভা দেখিয়া, সেই পাষণ্ড অধিকতর মুগ্ধ ও বিমোহিত হইয়া পড়িল এবং বলিল,—

"কে তোমাকে রক্ষা করে দেখি।"

বিহারী বাহুযুগলের দ্বারা সুরবালাকে বেষ্টন করিয়া ধরিবার উপক্রম করিলে, সেই সতী, প্রায় সংজ্ঞাহীনা হইয়া, তথায় বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন,—

"কে কোথায় আছ, আমাকে রক্ষা কর।"

তখন সহসা সেই প্রকোষ্ঠ যেন ঝলসিয়া উঠিল। বিহারী চমকিত হইয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে আগুল্ফ-

লম্বিতা, অপার্থিব রূপ-সম্পন্না, এক ত্রিশূলধারিণী সন্ন্যাসিনী আরক্ত নয়নে দণ্ডায়মানা। এই অভ্যাগত প্রতিবন্ধক দেখিয়া, বিহারী নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিল,—

"কে তুই! তুই এখানে কেন আসিলি? আমার হাতে তোর মৃত্যু আছে দেখিতেছি।"

এতক্ষণে সুরবালা চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। সেই স্বর্গ-কন্যাকে সম্মুখে সন্দর্শন করিয়া, তিনি বলিলেন,—

"তুমি আমার দিদি নও? দিদি, আমার এই দেহ নরকের কীটে যেন স্পর্শ না করে।"

সেই সন্ন্যাসিনী মধুর স্বরে বলিলেন,—

"ভয় কি বহিন্!"

ইত্যবসরে বিহারী, গৃহ মধ্যে একগাছি যষ্টি লইয়া সেই সন্ন্যাসিনীর শরীরে প্রচণ্ড আঘাত করিল। সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—

"রে ভ্রান্ত! তুই এখনই না বলের গর্ব্ব করিতেছিলি? দেখি তোর দেহে কত বল।"

এই বলিয়া সেই কুসুম-সুকুমারী বাম হস্ত দ্বারা বিহারীর দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। বিহারী তাঁহার হাত ছাড়াইবার জন্য বহুবিধ প্রযত্ন করিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। সেই কৃষকায়া সুন্দরীর দেহের শক্তি অনুভব করিয়া, সে বিস্মিত হইল এবং কোন উপায়ে তাঁহাকে নিপাত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

তখন সেই সন্ন্যাসিনী কহিলেন,—

"তোমার কোন চেষ্টাই সফল হইবে না। তোমার জন্য জীবন্ত নরকের ব্যবস্থা হইবে।"

তদনন্তর সুরবালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—

"উঠ দিদি আর কোন ভয় নাই।"

---

# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সেই পবিত্রতাপূর্ণ শান্তিনিকেতনের একতম সুরম্য কক্ষে সুরবালা, মাধুরী ও খোকা বসিয়া আছেন। সেই কক্ষ কুসুমমালায় সজ্জিত, গন্ধ দ্রব্যের সুরভি রাশিতে আমোদিত এবং দীপমালায় উজ্জ্বলিত। শান্তি-নিকেতন-বাসিনী পুণ্যশীলা নারীগণ, সুরবালাকে বেষ্টন করিয়া, বহুবিধ বিশ্রম্ভালাপে তাঁহাকে বিনোদিত করিতেছেন। তথায় তাঁহার কোনই অভাব নাই; কোন কারণেই অণুমাত্র অসুখ নাই। সেই দেবীগণের বদন হইতে যে সকল বাক্য বিনির্গত হইতেছে, তাঁহারা মধুর ভাবে, অপার্থিব কোমলতা সহকারে, যে যে কথোপকথন করিতেছেন, তৎসমস্ত সুরবালার হৃদয় মনকে নিতান্ত আর্দ্র ও প্রশান্ত করিতেছে। তিনি কোথায় আসিয়াছেন, কে, কি জন্য তাঁহাকে এখানে আনিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছুই তাঁহার মনে নাই। তিনি মনে করিতেছেন, যেন কোন পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে, নরদেহ ধারণ করিয়াও, তিনি এই দিব্যলোকে আগমন করিয়াছেন; তিনি অপরিসীম সুখে নিমগ্নচিত্ত থাকিলেও, এক অভাব তাঁহার প্রাণকে সময়ে সময়ে ব্যাকুলিত করিতেছে। কোথায় রমাপতি? সুরবালার পরম দেবতা, অনন্ত

উপাস্য, সর্ব্বগুণময় স্বামী এখন কোথায়? সেই নর-দেবতা সঙ্গে না থাকিলে, স্বর্গও সুরবালার পক্ষে নরক—স্বর্গও সুখশূন্য। সুরবালা দেবীগণের সংসর্গে অলৌকিক সুখ-সম্ভোগ করিলেও, সেই গুণময়ের অভাবজনিত ব্যাকুলতা হেতু, মধ্যে মধ্যে তত্রত্য দেবীগণকে তদ্বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাকে প্রীতিপ্রদ আশ্বাসবাক্যে পরিতুষ্ট করিতেছেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। তখন সেই শান্তিনিকেতনের একজন দেবী, সুরবালাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"আপনি ক্লান্ত আছেন—রাত্রিও অধিক হইয়াছে। এক্ষণে বিশ্রাম করুন। আর কোন প্রয়োজন থাকিলে, আজ্ঞা করুন।"

সুরবালা বলিলেন,—

"ক্লান্ত যথেষ্টই হইয় ছিলাম সত্য; কিন্তু এ স্বর্গ-ধামে আমার সকল কষ্টই অপগত হইয়াছে। তথাপি আমার চিত্ত অস্থির রহিয়াছে। আমার সেই সর্ব্বগুণাধার, দেবতুল্য স্বামী উপস্থিত না থাকিলে, স্বর্গও আমার চক্ষে নিতান্ত অসম্পূর্ণ।"

সেই দেবী আবার বলিলেন,—

"স্বামীকে দেখিতে পাইলেই আপানার সকল অন্তর-বেদনাই অন্তরিত হয় কি?"

সুরবালা বিষাদ বিমিশ্রিত হাস্যের সহিত বলিলেন,—

"দেবি! আপনারা নিশ্চয়ই অন্তর্যামী। আমার প্রাণের কথা কখনই আপনাদের অগোচর নাই। আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন না কি, ইহ সংসারে সেই স্বামী-দেবতার' চরণই আমার সার সম্পত্তি; সেই দেবতার সেবা ও বিনোদন আমার জীবনের একমাত্র ব্রত; সেই গুণময়ই আমার একমাত্র অভীষ্ট দেবতা। তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে, মৃত্যুই আমার অবলম্বনীয়। আপনারা আশ্বাস না দিলে, তাঁহাকে না দেখিয়া, আমি এতক্ষণ কখনই থাকিতে পারিতাম না। আপনারা সর্ব্বশক্তিসম্পন্না। আপনারা কৃপা করিয়া আমার এ যন্ত্রণা বিদূরিত করিতে পারেন না কি?"

সেই দেবী উত্তর দিলেন,—

"মা! তবে এখনই তোমার স্বামীর সহিত মিলন হউক।"

এই বলিয়া, তিনি আর এক দেবীকে পার্শ্বের দ্বার খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। দ্বার উন্মুক্ত হইল। সুরবালার সম্মুখে সেই দেবকান্তি রমাপতি দণ্ডায়মান। তখন সুরবালা বেগে গিয়া সেই বিশালোরস্ক পুরুষের বক্ষে মস্তক স্থাপন করিলেন; তখন সেই পুরুষবর অগ্রসর হইয়া, উভয় হস্তে সেই-সুরসুন্দরীকে আলিঙ্গন করিলেন। দেবীগণ এই অবকাশে প্রস্থান করিলেন।

প্রেমিকযুগল তখন তত্রত্য আসনে উপবেশন করিলেন। রমাপতি নিদ্রিত খোকা ও মাধুরীর অঙ্গে প্রেমপুলকিতান্তঃকরণে হস্তাবমর্ষণ করিয়া, সুরবালাকে কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুরবালাও একটা কথার উত্তর দিতে দিতে, আবার সাতটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলেন। তাঁহাদের সে প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইলে, আমাদের স্থান সঙ্কুলান হয় না; সুতরাং সংক্ষিপ্ততার অনুরোধে, আমরা তাঁহাদের ব্যক্যাবলীর মর্ম্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সুরবালার কথাই আগে বলি। তিনি একাকিনী বসিয়া যেরূপে মাধু ও খোকার খেলা দেখিতেছিলেন, বিহারী যেরূপে তাহাদের সহিত খেলা করিতেছিল, তাহার পর, যেরূপ কৌশল করিয়া ঝিদের ও ছেলেদের বাসা হইতে সরাইয়া দিল, যেরূপ উগ্রমূর্ত্তিতে সে তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিল, তাহার পর, যে জঘন্য প্রস্তাব করিল, যেরূপে তাঁহার দয়ার সে প্রার্থী হইল, তাহার পর যে প্রকার ভয় দেখাইল, তদনন্তর যে প্রকার বল প্রয়োগে উদ্যত হইল, তখন তাঁহার অবস্থা যেরূপ হইল, রক্ষার কোন উপায় নাই দেখিয়া তিনি যেরূপ ব্যাকুল হইলেন, সে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ কবিবার উপক্রম করিলে, তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া যেরূপে বসিয়া পড়িলেন, তদনন্তর, সহসা সেই রুদ্ধ দ্বার গৃহমধ্যে সন্ন্যাসিনী বেশে যেন স্বর্গ হইতে

তাঁহার দিদি যেরূপে অবতীর্ণা হইলেন, সেই দয়াময়ীকে বিহারী যেরূপ প্রহার করিল এবং তিনি যেরূপে বিহারীর হস্তধারণ করিলেন, ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত তিনি বর্ণনা করিলেন।

এই সকল ব্যাপার উত্তীর্ণ হইলে, বিহারীর এই দুর্ব্ব্যবহার হেতু দারুণ মনস্তাপে এবং বিজাতীয় উৎকণ্ঠায় তাঁহার সংজ্ঞা তাঁহাকে ত্যাগ করে। তিনি মূর্চ্ছিত হওয়ার পর তাঁহার কি হইল, তাহা তাঁহার মনে হয় না। সেই সংজ্ঞাহীনতা কতক্ষণ স্থায়ী হয়, তাহাও তাঁহার মনে নাই। মধ্যে এক দিন, কি দুই দিন, কি পাঁচ দিন অতীত হইয়াছে, তাহাও তিনি জানেন না। পুনরায় যখন পূর্ণভাবে তাঁহার সংজ্ঞা জন্মিল, তখন তিনি পুত্র-কন্যা সহ এই স্বর্গধামে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন বুঝিতে পারিলেন। কি উপায়ে তিনি এখানে আসিলেন, মাধুরী ও খোকাকেই বা কে তাঁহার সঙ্গে আনিল, বিহারীর কি হইল, ঝিরা কোথায় থাকিল, কিছুই তিনি ভাল করিয়া বলিতে পারিলেন না।

এস্থান কোথায়—ইহা কি পৃথিবীর অন্তর্গত কোন স্থান, অথবা স্বর্গরাজ্য, তাহা তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই। এখানে যে সকল দেবী বাস করেন, তাঁহাদের আকৃতি, বেশভূষা ও ব্যবহারাদি আলোচনা করিলে ইহা স্বর্গ ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না।

তাহার পর রমাপতির কথা। রমাপতি সায়ংকালে বাসায় ফিরিয়া দেখিলেন—ভবন শূন্য,—তথায় সুরবালা নাই, খোকা নাই, মাধুরী নাই, বিহারী নাই।—পাচক ও দুইজন ঝি অধোবদনে বসিয়া আছে। তাহারা অন্যান্য বৃত্তান্ত কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল বলিল যে, তাহারা ঠাকুরাণীকে পীড়িতা দেখিয়াছিল। একজন সন্ন্যাসিনী তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলেন, আর বিহারী বাবু শৃঙ্খলাবদ্ধ দশায় দূরে পড়িয়াছিলেন। তাহার পর তাহারা সেই সন্ন্যাসিনীর আদেশ ক্রমে, একজন জল গরম করিতে যায়, একজন নদী হইতে জল আনিতে যায় এবং একজন বাজার হইতে ধুনা আনিতে যায়। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখে বাটীতে কেহই নাই। ঠাকু-রাণী ও তাঁহার সন্তান, বিহারী বা সেই সন্ন্যাসিনী কেহই নাই। তাহারা দারুণ উদ্বেগে সমস্ত দিন সেই অপরিচিত প্রদেশের চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের সন্ধান করে; কিন্তু কোনই ফল হয় না। অবশেষে তাহারা, অনাহারে ও উৎকণ্ঠায় নিতান্ত কাতর হইয়া, মৃতকল্প অবস্থায় পড়িয়া আছে।

এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রমাপতি নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে একাকী গৃহনিষ্ক্রান্ত হন এবং কোথায় যাইলে কি হইবে তাহার কিছুই মীমাংসা না করিয়া, উন্মত্তবৎ একদিকে প্রধাবিত হইতে থাকেন। দ্বার-বানাদি তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে দেখিয়া তিনি বিরক্তি

সহকারে তাঁহাদের প্রতিনিবৃত্তি হইতে আজ্ঞা করেন। তাহারা চলিয়া গেলে, তিনি দামোদর অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ অরণ্য-পথে চলিতে চলিতে, বড়তড়ে নামক ক্ষুদ্র গ্রামের সন্নিকটে উপস্থিত হন। তথায় বিজাতীয় উৎ-কণ্ঠায় ও যৎপরোনাস্তি দৈহিক কাতরতায়, তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন এবং ক্রমশঃ চেতনা বিহীন হন। তদনন্তর কি ঘটিয়াছে তাহা তাঁহার মনে নাই। যথন তাঁহার চৈতন্ত উদয় হইল, তথন তিনি দেখিলেন, এই অপরিচিত স্থানে ভূলোকতুর্ল্লভ বহুতর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। তিনি সংজ্ঞালাভ সহকারে "সুরবালা" "সুরবালা" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলে, তাঁহারা তাঁহাকে এই কক্ষে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন।

এই সময়ে গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সুরবালা বলিলেন,—

"আহা! সে দেবীরা এখন কোথায় গেলেন? তুমি তাঁহাদের দেখিতে পাইলে না! প্রাণেশ্বর! সত্যই কি আমরা স্বর্গে আসিয়াছি?"

রমাপতি বলিলেন,—

"আমিও তো এখানে আসিয়া অনেক দেবদেবীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। এ স্থান স্বর্গ বলিয়াই আমারও মনে হইতেছে। ইহাই কি সেই সুকুমারীর লীলা স্থল?"

তাঁহারা যথন বিস্ময় সহকারে এবংবিধ আলোচনায়

নিযুক্ত এবং অপার আনন্দে নিমগ্ন, তখন সেই স্থানে এক কৃষ্ণাঙ্গী, জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তী, বিবিধ আহার্য্য পূর্ণ স্বর্ণ পাত্র হস্তে লইয়া, সমাগত হইলেন। ভূপৃষ্ঠে সে পদ অতি সন্তর্পণে পতিত হইতেছে, বসুধা যেন সে পাদ-বিক্ষেপ জানিতেও পারিতেছেন না। তাঁহাকে দর্শনমাত্র দম্পতী সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি বলিলেন,—

"আপনারা বড়ই ক্লান্ত হইয়াছেন; এক্ষণে কিছু আহার করিয়া বিশ্রাম করুন।"

রমাপতি সবিনয়ে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমরা ভাগ্যবলে অমর লোকে আসিয়াছি। আমাদের আর ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই। আপনিই কি এখানকার অধিষ্ঠাত্রী?"

সেই দেবী মধুর হাস্য সহকারে বলিলেন,—

"না না, শান্তিদেবী এই পুণ্য নিকেতনের অধিষ্ঠাত্রী। এ পাপীয়সী তাঁহার দাসী।"

কি সুকণ্ঠ! কি মধুময় ভাষা! রমাপতি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"তবে আপনি কে?"

দেবী উত্তর দিলেন,—

"সুরমা।"

---

# নবম পরিচ্ছেদ।

আমরা এ পর্য্যন্ত একে একে শান্তিনিকেতনের দেব-মন্দির, যোগমঠ, পুষ্পবাটিকা, কারাগার প্রভৃতি নানা স্থান দর্শন করিয়াছি। কিন্তু সকল অংশ এখনও আমাদের নেত্র-পথবর্ত্তী হয় নাই। এই সুবিশাল পুরীর এক স্বতন্ত্র অংশের নাম শাসনপুরী। তথায় যে যে ব্যাপার নির্ব্বাহিত হয়, তাহা আলোচনা করিলে, সে স্থানকে নরক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই শাসনপুরীর সহিত শান্তিনিকেতনের অপরাপর অংশের নানাবিধ উপায়ে সংযোগ ও সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সেই সকল সংযোগের ব্যবস্থা এতাদৃশ সুকৌশল-সম্পন্ন যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তাহার নির্ণয় হওয়া সম্পূর্ণরূপ অসম্ভব। উক্ত শাসনপুরী মূল শান্তিধাম হইতে বহুদূরে অবস্থিত হইলেও, তথায় অলক্ষিত ভাবে যাতায়াতের নানাবিধ সহজ উপায় আছে এবং তত্রত্য ব্যাপার সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিবার বহুতর ব্যবস্থা আছে।

ঐ শাসনপুরী কৃষ্ণ প্রস্তর বিনির্ম্মিত ভূগর্ভাভ্যন্তরগত বহ্বায়ত ভবন। যদিও তাহা সতত ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন তথাপি আবশ্যক হইলে, সহজেই তন্মধ্যে আলোক প্রবে-

শের উপায় আছে। সেই পুরী বহুদূর ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং তাহার একাংশে যাহা সংঘটিত হয়, অপরাংশে তাহার প্রচার হয় না। সেই পুরীর নানাস্থানে নানাবিধ দণ্ড প্রয়োজনোপযোগী আয়োজন আছে।

সেই নিবিড় অন্ধকারময় পুরের একতম কক্ষে, এক শৃঙ্খল-বদ্ধ পুরুষ অধোবদনে ভূ-পৃষ্ঠে শায়িত আছে তাহার কণ্ঠদেশ, বাহুদ্বয়, চরণযুগল এবং কটিদেশ লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সে ব্যক্তি শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া, মুক্তি-লাভের জন্য বিস্তর বিফল প্রযত্ন করিয়াছে। অবশেষে হতাশ ও অবসন্ন হইয়া, প্রায় চেতনাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে। বহুক্ষণ এইরূপ মৃতকল্প ভাবে পড়িয়া থাকার পর, সে একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী হইল, কিন্তু দেহকে বিন্দুমাত্র স্থানান্তরিত করিতে সাধ্য হইল না। তখন সে নিতান্ত কাতর স্বরে বলিল,—

"মাগো! এ যাতনা আর সহে না। ইহার অপেক্ষা মরণই ভাল।"

তখন সহসা সেই সুবৃহৎ পুরী বিকম্পিত করিয়া, বজ্র-গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন হইল,—

"রে নরাধম! এখন তুই নিজ দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিস্ কি? অতঃপর তুই আপনার মনকে ধর্ম্মপথে চালিত করিতে সম্মত আছিস্ কি?"

কাহার এ অত্যুৎকট ভৈরবধ্বনি? মনুষ্য কণ্ঠ হইতে

এতাদৃশ রব বিনির্গত হওয়া সম্ভবপর নহে। তখন সেই শায়িত ব্যক্তি বলিল,—

"যতক্ষণ এ দেহে জীবন থাকিবে ততক্ষণ আমি সুরবালা লাভের বাসনা পরিত্যাগ করিব না। তুমি আমার যন্ত্রণা-দায়ক। তুমি দেবতাই হও, বা প্রেতই হও, বা মানবই হও, কেন তুমি আমাকে বারংবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিতেছ? আমি সর্ব্ববিষয়ে ধর্ম্মপথে মনকে চালিত করিতে সম্মত আছি। কিন্তু সুরবালার আশা ত্যাগ করিতে আমার সাধ্য নাই। আমি আজীবন জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি তজ্জন্য চিরকাল অনুতাপ করিতে সম্মত আছি; কিন্তু সুরবালার লোভে আমি যাহা করিয়াছি, তাহা দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। যদি আবশ্যক ও সুযোগ হয়, তাহা হইলে, তদপেক্ষা বহুগুণে অধিকতর দুষ্কর্ম্ম আমি মহানন্দে আবার সম্পন্ন করিব।"

সেই গম্ভীর স্বরে পুনরায় শব্দ হইল,—

"রে কৃতঘ্ন দুর্বৃত্ত বিহারি, যদি এখনও তুই সাবধান হইতে না পারিস্, তাহা হইলে তোর প্রাণদণ্ড হইবে।"

বিহারী বলিল,—

"প্রাণদণ্ড! তুমি যেই হও, তুমি আমার পরম মিত্র। যদি সুরবালাকে লাভ করিতে না পারি তাহা হইলে প্রাণদণ্ডই আমার পক্ষে অতি প্রার্থনীয় সুব্যবস্থা। কিন্তু

যদি যাবজ্জীবন এইরূপে থাকিলে, এক দিনও সুরবালাকে লাভ করিতে পারি, তাহাতেও আমি সম্মত আছি।”

সেই অত্যুৎকট শব্দে উত্তর হইল,—

“এখনই তোর ন্যায় নরাধমের প্রাণদণ্ড করিলে তোর প্রতি করুণা প্রকাশ করা হয়। এবার তোর জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা করিতেছি, তাহা সহ্য করা কাহারও সাধ্য নহে।”

বিহারী বলিল,—

“দেও, যে শাস্তি ইচ্ছা দেও। প্রাণ থাকিলে কখন না কখন সুরবালাকে লাভ করিতে পারিব, এই আশায় সকল শাস্তিই আমি সহ্য করিতে সক্ষম।”

তখন বিকট শব্দে আদেশ ব্যক্ত হইল,—

“দূতগণ! এই নরাধমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর।”

তৎক্ষণাৎ ছয়জন কৃষ্ণকায় বিকট-মূর্ত্তি পুরুষ আবির্ভূত হইল। তাহারা এরূপ ভাবে আগমন করিল, যেন তাহারা ভূতল ভেদ করিয়া উত্থিত হইল, অথবা ভিত্তি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যাহা হউক, তাহারা আসিয়া, বিহারী যে সকল শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, তাহার অপর প্রান্ত গুলি খুলিয়া ফেলিল। বিহারী সেই সুযোগে একবার মুক্ত হইবার চেষ্টা করিলে, একজন এরূপ বজ্রমুষ্টিতে তাহার হস্ত ধারণ করিল

যে, বিহারী নিশ্চয় বুঝিল এরূপ দৈত্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা অসম্ভব।

অতঃপর দূতগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ বিহারীকে লইয়া চলিল। বহুদূর যাইতে যাইতে ক্রমে উত্তপ্ত বায়ু বিহারীর অঙ্গস্পর্শ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ সেই উত্তাপ উগ্রতর হইতে লাগিল। তখন দূতেরা পার্শ্বস্থ এক কক্ষের দ্বার খুলিয়া ফেলিল। তথাকার বায়ু অতিশয় উত্তপ্ত। দূতেরা বিহারীকে সেই কক্ষের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

দারুণ উত্তাপে বিহারী ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার দেহ উত্তাপে অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে কিয়ৎক্ষণ ব্যাকুলতা সহকারে আর্ত্তনাদ করিয়া, শেষে নিশ্চেষ্ট হইল।

তখন সেই বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষে পুনরায় প্রশ্ন হইল,—

"রে হতভাগ্য, এখনও পাপ প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিস্‌ কি ?"

নিতান্ত বিরক্তির সহিত অবসন্ন বিহারী বলিল,—

"তুমি যেই হও, তুমি মূর্খের একশেষ। তুমি কেন বারংবার আমার সহিত পরিহাস করিতেছ? যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ ঐ বাসনা পরিত্যাগ করিতে আমার সাধ্য নাই।"

সেই বিকট শব্দে পুনরায় আদেশ হইল,—

অতঃপর তোর যে শাস্তি হইবে, তাহা মনে করিলেও শরীর শিহরিতে থাকে। দেখ্ পাপাত্মন্! এখনও অনুতাপ করিতে প্রবৃত্ত হ।”

বিহারী বলিল,—

“কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া কেহ কদাপি অনুতাপ করে না। আমার যে অপরাধে তোমরা আমাকে এইরূপে শাস্তি দিতেছ, তাহা আমার পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য। একবার কেন, সুযোগ উপস্থিত হইলে, যতক্ষণ বাসনা নিবৃত্তি না হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ আমি সেইরূপ, বা তদপেক্ষা গুরুতররূপ ব্যবহার করি ! অনুতাপ! রে মূঢ় অনুতাপ কিসের?”

সেই অত্যুৎকট শব্দে আদেশ ব্যক্ত হইল,—

“দূতগণ! ইহাকে কণ্টকারণ্যে নিক্ষেপ কর!”

তৎক্ষণাৎ সেই কৃষ্ণকায় বিকটমূর্ত্তি ছয় জন দূত বিহারীকে সেই প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আনিল এবং পূর্ব্ববৎ বহুদূর বহন করিয়া লইয়া চলিল। তাহার পর, পার্শ্বস্থ এক প্রকোষ্ঠের দ্বার মুক্ত করিয়া, তন্মধ্যে বিহারীকে ফেলিয়া দিল। সেই প্রকোষ্ঠের সর্ব্বত্র অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্মাগ্র লৌহ-শলাকা সংলগ্ন। কাতর ও দুর্ব্বল বিহারীকে সেই প্রকোষ্ঠে ফেলিয়া দিলে, তাহার পদদ্বয় অসংখ্য স্থানে বিদ্ধ হওয়ায়, সে নিতান্ত ব্যথিত হইল এবং তাড়াতাড়ি হাতে ভর দিয়া

পা উঠাইতে গেল। হস্তেও তদ্বৎ যাতনা হওয়ায় সে পড়িয়া গেল। দেহের এক পার্শ্বে অসহনীয় জ্বালা হওয়ায়, সে অপর পার্শ্বে ফিরিল। হায়! অভাগা পাপীর কোথাও নিস্তার নাই। বিহারীর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রুধির প্রবাহিত হইতে থাকিল। সে মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়া রহিল। কিয়ৎকাল পরে অসহ্য জ্বালায় অভিভূত হইয়া বিহারী বলিল,—

"কোথায় তুমি অদৃষ্টচর পুরুষ! আমার প্রাণ যায়—আমাকে রক্ষা কর।"

তৎক্ষণাৎ সেই বিকট স্বরে প্রশ্ন হইল,

"এতক্ষণে, রে নরাধম! তোর হিতাহিত বোধের আবির্ভাব হইয়াছে কি? তুই অনুতাপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিস্ কি?"

তখন কাতর বিহারী বলিল,—

"অনুতাপ করিতে পারি। কিন্তু সুরবালা লাভের বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। না না, তাহা আমার অসাধ্য। প্রাণ যায়। তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

সেই স্বরে উত্তর হইল,—

"রে পিশাচ! এখনও তোর অদৃষ্টে আরও কঠিনতর শাস্তি আছে। এখনও তুই নিজ অপরাধ প্রণিধান করিয়া অনুতাপ করিতে প্রস্তুত নহিস্? দেখি কতক্ষণ তুই এই ভাবে চলিতে পারিস্!"

বিহারী সরোদনে বলিল,—

"না না, তুমি যেই হও, তোমার চরণে ধরি, তুমি আমাকে আর শাস্তি দিও না। তোমার বাধ্য হইতে আমার অনিচ্ছা নাই। কিন্তু তুমি অসাধ্য প্রস্তাব করিলে আমি কিরূপে পালন করি?"

সেই স্বরে আবার আদেশ ব্যক্ত হইল,—

"দূতগণ!—

বিহারী বাধা দিয়া বলিল,—

"না না—তোমার দূতগণকে আর ডাকিও না। বল আমি কি করিব আমার প্রাণ যায়। দেখিতেছি, তুমি সর্ব্বশক্তিমান—তোমার বিরুদ্ধাচারী হওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। তুমি সুরবালার লোভ আমাকে ত্যাগ করিতে বলিও না। আর যাহা বলিবে, তাহাই আমি শুনিতে প্রস্তুত আছি।"

পুনরায় সেই স্বরে শব্দ হইল,—

"রে নরাধম! তোর অদৃষ্টের ভোগ এখনও ফুরায় নাই। তোকে আরও কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। দূতগণ! এই হতভাগাকে আলোকালয়ে লইয়া যাও।"

তৎক্ষণাৎ সেই বিকটাকার দূতগণ, বিহারীর রুধিরাক্ত দেহ সেই প্রকোষ্ঠ হইতে, ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিল।

# দশম পরিচ্ছেদ।

সেই শাসনপুরীর এক আলোকিত অংশে বিহারী মৃতকল্প অবস্থায় শায়িত রহিয়াছে। এক সুগঠিত কলেবর পুরুষ বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছেন। সেই পুরুষ রমাপতি। বিহারী অচেতন; সুতরাং সে জানিতে পারে নাই, কে তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত।

রমাপতি বাবু বহুক্ষণ ধরিয়া নানাপ্রকার যত্ন করিলে পর, বিহারীর দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব হইল। সে তখন রমাপতিকে দেখিতে ও চিনিতে পারিল। রমাপতি বলিলেন,—

"ভাই! তোমার এই অবস্থা দেখিয়া আমি বড়ই কাতর হইয়াছি। কি করিলে তোমার যাতনা শান্তি হয় তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তোমার কি এখন বড়ই কষ্ট হইতেছে ভাই?"

বিহারী বলিল,—

"কে তুমি? তুমি কি রমাপতি? তুমি কি আমার এই দুরবস্থার সময় পরিহাস করিতে আসিয়াছ? যাও তুমি! তুমি আমার পরম শত্রু। তোমার জন্য, আমি আমার চিরদিনের বাসনা সফল করিতে পাইলাম না।

তুমি আসিয়া না জুটিলে, তুমি জলে ডুবিয়া আবার বাঁচিয়া না উঠিলে, সুরবালার অন্য কাহারও সহিত বিবাহ হইত। তাহা হইলে আমি, প্রকাশ্যে না হউক অপ্রকাশ্যেও সেই সুন্দরীর প্রেম উপভোগ করিতে পাইতাম। তুমি আমার পরম শত্রু। তুমি মরণাপন্ন হইয়াছিলে, আমি মনে করিয়াছিলাম, এত দিন পরে ভগবান কৃপা করিয়া, আমার কণ্টক দূর করিয়া দিবেন। কিন্তু কি ভয়ানক! আমাকে চিরদিন জ্বালাইবার জন্য, তুমি সে অবস্থা হইতেও বাঁচিয়া উঠিয়াছ! তোমার কি মৃত্যু নাই? তুমি আমার প্রভু, তুমি আমার প্রতিপালক, তথাপি আমি তোমার প্রবল শত্রু। যাও তুমি। তুমি এখানে মজা দেখিতে আসিয়াছ? তুমি সুখী, তুমি ভাগ্যবান। সুরবালা তোমার আপনার। যে এত সুখী সে কি কখন দুঃখীর বেদনা জানিতে পারে? যাও ভাগ্যবান পুরুষ! এই হতভাগা যতক্ষণ জীবিত আছে, ততক্ষণ তোমার ভয়ানক শত্রু বর্ত্তমান। এ শত্রুর নিকট হইতে তুমি তোমার সুরবালার নিকট যাও। যে দিন তোমাকে নিপাত করিয়া সুরবালাকে অধিকার করিতে পারিব, সেই দিন আমার যন্ত্রণার শান্তি হইবে। যাও তুমি—আমার সম্মুখ হইতে পলায়ন কর।"

রমাপতি বলিলেন,—

"ভাই বিহারি! তোমার যন্ত্রণার কথা শুনিয়া আমি

আন্তরিক দুঃখিত 'হইতেছি। বুদ্ধির দোষে তোমার এইরূপ ক্ষণিক মতিভ্রম হইয়াছে বুঝিয়া, আমি তোমার উপর বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক বরং যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইতেছি। এরূপ মতিভ্রম একটুও অস্বাভাবিক নহে। সকলেরই এরূপ পদস্খলন সম্ভব। তাহা না হইলে, তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরই বা এরূপ মন হইবে কেন? তুমি আমাকে শত্রু বলিয়া মনে করিলেও, আমি তোমাকে এখনও অকৃত্রিম সুহৃদ বলিয়া মনে বিশ্বাস করি এবং তোমাকে সহোদরাধিক আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করি। তুমি সম্প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছ, লোকে তাহা অতিশয় দুষ্কর্ম্ম বলিয়া মনে করিলেও, আমি তাহা সামান্য মতিভ্রম, ক্ষণিক মোহ, এবং নগণ্য মনশ্চাঞ্চল্য বলিয়াই মনে করিতেছি। ভাই! সে ব্যবহার আমার মনেও নাই এবং কখন মনে থাকিবেও না। এক্ষণে কিসে তুমি সত্বর স্বাস্থ্যলাভ করিতে সক্ষম হইবে, ইহাই আমার একমাত্র চিন্তার বিষয়।”

বিহারী বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল,—

“রমাপতি! তোমাকে অনেক সময় লোকে দেবতা বলে। তোমার প্রকৃতি দেখিয়া তোমাকে দেবতা বলিয়াই মানিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তুমি সুরবালার স্বামী; এইজন্য আমার চক্ষে তোমার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। আমার সহিত তোমার মিত্রতা অসম্ভব। তুমি দেব;

এজন্য দেবী লাভ করিয়া সুখী হইয়াছ। আমি নারকী— দিনেকের নিমিত্ত সেই দেবী লাভের আশা করিয়া এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। তুমি যাও, তোমার ন্যায় দেবতার এ নারকীর নিকট থাকিবার প্রয়োজন নাই।"

রমাপতি বলিলেন,—

কেন ভাই এরূপ মনে করিতেছ? কিসে তুমি নারকী, আর আমি দেবতা? তোমার শরীরে কোন গুণ নাই ভাই? তুমি কেন অকারণ কাতর হইতেছ? আমি অপরিসীম ভাগ্যবলে সুরবালার স্বামী হইয়াছি সত্য; কিন্তু ভাই তুমিও তো অপরিসীম সুকৃতিবলে সেই দেবীর ভাই হইয়াছ। উভয়েরই সম্বন্ধ অতি পবিত্র—অতি নিকট। যদি তুমি সুরবালাকে যথার্থই ভাল বাস, তাহা হইলে ভ্রাতৃভাবে তাঁহাকে আদর করিয়া, তাঁহাকে যত্ন করিয়া, তাঁহাকে ভাল বাসিয়া তোমার প্রাণের কি তৃপ্তি হয় না ভাই? তবে তোমার কিসের ভালবাসা বিহারি? সুরবালা যাহার ভগিনী, সুরবালা যাহাকে সহোদর তুল্য ভালবাসে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান। তুমি ভাবিয়া দেখ ভাই, যদি সুরবালা সুখে থাকে, তাহা হইলে সে সুখে তোমারও যেমন আনন্দ, আমারও তেমনই আনন্দ। সুরবালার স্বামী যদি দেবতা হয়, সুরবালার ভ্রাতাও দেবতা সন্দেহ নাই। কেন ভাই, তবে তুমি কাতর হইতেছ?"

বিহারী, অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া, বলিল,—

"ভাই রমাপতি! আমি তো মরণাপন্ন। আমার যে অবস্থা হইয়াছে, বোধ হয় আমি আর অধিকক্ষণ বাঁচিব না। তুমি আমাকে বিশ্বাস করিয়া, আমার এই মরণকালে একবার সুরবালাকে দেখাইতে পার না কি? আমার আর সামর্থ্য নাই, কোন প্রকার অত্যাচার করিতে আমি অক্ষম। এ অবস্থাতেও তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে পার না কি?"

রমাপতি ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিলেন,—

"অবশ্যই পারি—এখনই সুরবালা এখানে আসিবেন। তুমি যদি সুস্থ ও সবল থাকিতে, তাহা হইলেও, তোমার প্রস্তাবে আমি একটু আপত্তি করিতাম না। তুমি সুর-বালার ভাই, তুমি আমার অভিন্ন-হৃদয় বান্ধব। তোমাকে আমার এতই বিশ্বাস যে, সুরবালা যখন তোমার নিকট থাকিবেন, তখন আমরা কেহই এখানে থাকিব না। তোমার সেই ভগিনী, একাকিনী তোমার নিকট অব-স্থিতি করিয়া, তোমার শুশ্রূষা করিবেন।"

এতক্ষণে বিহারীর চক্ষে জল পড়িল। সে বলিল,—

"যথার্থই রমাপতি স্বর্গের দেবতা। ধিক্ আমাকে! আমি এই দেবতার বিরুদ্ধে অত্যাচার করিয়াছি!"

তখন সহসা শাসনপুরীর সেই অংশ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সুরবালাকে বেষ্টন করিয়া বহুতর জ্যোতির্ম্ময়ী

দেবী তথায় আগমন করিলেন। বিহারী এই সকল দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বলিল,—

"আমি যদি মহাপাপী না হইতাম, তাহা হইলে মনে করিতাম, আমার মরণকালে স্বর্গের দেবীগণ দর্শন-দানে আমাকে ধন্য করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু কোথায় সে দেবী? আমার কৃপাময়ী ভগিনী সুরবালা কোথায়?"

সুরবালা অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—

"এই যে দাদা। দাদা! তোমার এত কষ্ট হইয়াছে?"

বিহারী দেখিল, তাহার সম্মুখে সেই অপাপবিদ্ধা, পবিত্রতাময়ী সুন্দরী সাশ্রুনয়নে দণ্ডায়মানা।

রমাপতি বলিলেন,—

"সুরবালা! তুমি তোমার দাদার শুশ্রূষা করিতে থাক। আমরা আসি এখন।"

সুরবালার সঙ্গিনীগণ ও রমাপতি পশ্চাদাবর্ত্তন করিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া, বিহারী বলিলেন,—

"না না, আপনারা যাইবেন না। দয়া করিয়া এ অপবিত্র অধমের নিকটে আর একটু থাকিয়া যান।"

তাহার পর সুরবালার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—

"সুরবালা! তুমি আমার আশ্রয়-দাতার কন্যা, আমার প্রভুপত্নী। তুমি তোমার এ অন্নভোজী দাসকে চিরদিন সহোদর তুল্য স্নেহ করিয়া থাক। আমি, দারুণ

দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছি, তাহা প্রায়শ্চিত্তাতীত এবং ক্ষমার অযোগ্য। অনন্তকাল নরক নিবাসে বা চিরদিনের অনুতাপেও আমার সে কলঙ্ক অপনীত হইবার নহে। এক্ষণে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। দেবি! ভগিনি! জননি! আমার এ দুঃসময়ে তুমি যদি আমাকে ক্ষমা কর, তাহা হইলে আমি কথঞ্চিৎ প্রবোধ লাভ করিয়া মরিতে পারি। দিদি আমার! এরূপ অধমকে ক্ষমা করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইবে কি?"

তখন গলদশ্রুনয়না সুরবালা বলিলেন,—

"দাদা! আমাদের ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইবে? আমি সেবা করিয়া, যেমন করিয়া পারি তোমাকে ভাল করিব। না দাদা, তুমি ওকথা আর মুখে আনিও না। তুমি কি করিয়াছ যে, তোমাকে ক্ষমা করিতে হইবে? তোমার কোন দোষের কথা আমার মনেও নাই!"

তখন সেই শয্যাশায়ী বিহারী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—

"রে নরাধম! তুই এই দেবীকে কলুষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলি! চিরনরকই তোমার একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি। সুরবালা, তবে দিদি, আমার মাথায় তোমার চরণ ধূলা দেও; আমার পাপ-কলুষিত দেহ-মন পবিত্র

হউক। তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, আমি কায়স্থ। আমার এমন সমর্থ্য নাই যে আমি উঠিয়া তোমার পদধূলি গ্রহণ করি।"

তখন বজ্রগম্ভীর স্বরে, সমস্ত পুরী বিকম্পিত করিয়া, শব্দ হইল,—

"সামর্থ্য আছে—তুমি যাতনা মুক্ত হইয়াছ। এ পুরী আর তোমার যোগ্য স্থান নহে। তুমি এক্ষণে শান্তিনিকেতনে গমন কর।"

বিহারী অনায়াসে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং অতীব ভক্তি সহকারে সুরবালার সমীপস্থ হইয়া তাঁহার পদ-ধূলি গ্রহণ করিলেন। তদন্তর নিরতিশয় প্রীত মনে তাহা স্বকীয় মস্তকে ও দেহের অন্যান্য ভাগে বিলে-পিত করিতে থাকিলেন।

তখন তত্রত্য তাবৎ ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

"জয় শ্যামসুন্দরের জয়!"

---

# একাদশ পরিচ্ছেদ।

রমাপতি ও সুরবালা শান্তিনিকেতনের সেই নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট আছেন। শান্তিনিকেতনের আর কোন অংশই তাঁহারা দেখিতে পান নাই। তাহাদের এই নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ, আর শাসনপুরীর একাংশ মাত্র তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কিন্তু কি ভয়ানক ব্যাপার! কি অলৌকিক কাণ্ড! কি স্বর্গীয় ভাব! বিহারী বাবুর নিকটস্থ হইয়া তাঁহারা যে যে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রতীতি হইয়াছে যে, নরলোক এতাদৃশ বিসদৃশ কাণ্ডের অভিনয় হওয়া নিতান্ত বিচিত্র কথা। বিহারীর সেই ভয়ানক শাস্তি, সুরবালার সহিত তাঁহার দর্শনেচ্ছা হইবা মাত্র সুরবালার তথায় গমন, সুরবালার সঙ্গিনীগণের অপরূপ কান্তি, অশ্রুতপূর্ব্ব ভয়ানক স্বরে বিহারীর প্রতি আদেশ, বিহারীর কাতর ও মরণাপন্ন দেহে সহসা সম্পূর্ণ শক্তি সঞ্চার প্রভৃতি ব্যাপার সমূহ তাঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি অভিভূত করিয়াছে। এ স্থান যদি স্বর্গ বা স্বর্গের অংশ বিশেষ না হয়, তাহা হইলেও তত্রত্য অধিবাসীবর্গ যে দেবশক্তি-

সম্পন্ন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের কোনই সন্দেহ নাই। দিব্য-কান্তিবিশিষ্ট অনেক মূর্ত্তি তাঁহাদের দেখা দিয়াছেন, কিন্তু দুই এক জন ব্যতিরেকে আর কাহারও সহিত তাঁহাদের বিশেষ কথাবার্ত্তা হয় নাই। এই স্থান সংক্রান্ত কোন রহস্য-জালই তাঁহারা ছিন্ন করিতে পারেন নাই। কে এখানকার রাজা, কে পালক ও ও নিয়ন্তা কিছুই তাঁহারা জানেন না। তাঁহারা শুনিয়াছেন, শান্তিদেবী এই স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী। কিন্তু কে তিনি ?

কোন বিষয়েই তাঁহাদের কোনই অসুবিধা নাই। নিয়মিত সময়ে স্নান, আহারাদির বিশেষ সুব্যবস্থা। মাধুরী ও খোকার খেলার যথেষ্ট আয়োজন। তাঁহাদের ভোগ-বিলাস-সাধনোপযোগী সামগ্রীরও অভাব নাই। কে এ সকল দেয়, কেনই বা দেয়, কোথা হইতে এ সকল সংগৃহীত হয়, এ সকল সংবাদ কিছুই জানিতে না পারিয়া, তাঁহারা নিতান্ত কৌতুহলাবিষ্ট ও বিস্ময়াকুল হইয়াছেন।

তাহার পর, তাঁহাদের বিস্ময়ের প্রধান কারণ, সুরমা দেবীর ব্যবহার। বহুক্ষণ তাঁহার এই কথা আলোচনা করিয়া রমাপতি বলিলেন,—

"যেন ঐ দেবীর মূর্ত্তি পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া আমার এক একবার মনে হয়।"

সুরবালা বলিলেন,--

"আমারও মনে হয়, যেন আমি ঐ দেবীকে আর কোথায়ও দেখিয়া থাকিব। কিন্তু অনেক ভাবিয়াও কিছুই আমার মনে পড়িতেছে না। সংসারে এরূপ অপার্থিব রূপ-গুণ সম্পন্না দেবীর দর্শন পাওয়া নিতান্তই অসম্ভব সুতরাং আমাদের ভ্রম হইয়াছে ভিন্ন আর কিছুই মীমাংসা হয় না।"

এইরূপ সময়ে কালোরূপে দশদিক আলো করিয়া সুরমা দেবী সেই স্থলে সমাগতা হইলেন। তাহাকে দর্শনমাত্র রমাপতি ও সুরবালা ভক্তি সহকারে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। তখন সেই দেবী, নয়ন মুদিয়া শ্যামসুন্দরকে ধ্যান করিতে করিতে বলিলেন,—

"শ্যামসুন্দর আপনাদিগকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করুন।"

তখন রমাপতি বলিলেন,—

"দেবি! আপনাদের কৃপায় আমরা এখানে সকল প্রকার সুখভোগ করিতেছি সত্য; কিন্তু আমাদের চিত্ত এই ভূ-লোক দুর্লভ স্থানের অশেষ রহস্যজাল বিচ্ছিন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া উত্তরোত্তর বড়ই অস্থির হইতেছে। আপনি কৃপা করিয়া আমাদের এই অস্থিরতা বিদূরিত করুন।"

মধুমাখা কোমল স্বরে সুরমা বলিলেন,—

"এখানে রহস্য কিছুই নাই। ইহা শান্তিদেবীর নিকেতন। সেই দেবী সরলার একশেষ। আপনারা ক্রমশঃ জানিতে পারিবেন, শান্তিদেবীর অলৌকিক শক্তিতে এ স্থানের সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।"

সুরবালা বলিলেন,—

"কিন্তু দেবি, অন্য কথা দূরে থাকুক, আমাদের চক্ষে আপনিই যেন অশেষ রহস্যজালজড়িতা। আপনাকে যেন আমরা কোথায় কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়; অথচ কিছুই স্মরণ করিতে আমাদের সাধ্য নাই।"

সুরমা বলিলেন,—

"এক সময়ে আমি আপনাদের বিশেষ পরিচিতা ছিলাম; আমার কথা মনে পড়া বিচিত্র নহে। শান্তিদেবীর চরণ-ধূলায় আমার পুনর্জন্ম হইয়াছে। আমার পূর্ব্ব আকৃতির ছায়া অপগত হয় নাই। এখানে যত লোক আছেন, সকলেরই পুনর্জন্ম হইয়াছে।"

রমাপতি বলিলেন,—

"আপনি আমাদের বিশেষ পরিচিতা ছিলেন! কিন্তু দেবি! আমরা তো কিছুই মনে করিতে পারিতেছি না। এরূপ দিব্যজ্যোতিঃ কোন মানুষের শরীরে হয় কি? না দেবি! আপনার সহিত পূর্ব্বপরিচয় নিতান্ত অসম্ভব।"

সুরমা বলিলেন,—

"আপনার দেশে, শশি ভট্টাচার্য্য নামে এক নিরীহ

ব্রাহ্মণ ছিলেন মনে আছে? তাঁহার ব্যভিচারিণী পত্নী তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল মনে পড়ে? আমিই পূর্ব্ব জন্মে সেই ব্যভিচারিণী পতিহন্ত্রী ছিলাম ”

সুরবালা সবিস্ময়ে বলিলেন,—

“তবে—তবে আপনিই কি কালী?”

“কালীর মৃত্যু হইয়াছে। আমি সুরমা।”

“কিন্তু এরূপ জ্যোতির্ম্মান পুণ্য-প্রদীপ্ত কলেবর কেমন করিয়া হইল? আপনার পূর্ব্বাকৃতির ছায়াও আপনার বর্ত্তমান দেহে আছে কি না সন্দেহ।”

সুরমা বলিলেন,—

“শ্যামসুন্দর আর শান্তিদেবী জানেন।”

রমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,—

“কিন্তু আপনি সেই প্রহরী-পরিবেষ্টিত কারাগার হইতে মুক্ত হইলেন কিরূপে?”

সুরমা উত্তর দিলেন,—

“শান্তিদেবীর অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁহার কৃপা হইলে, সকলই সম্ভব।”

সুরবালা বলিলেন,—

“বস্তুতই আপনি দেবত্ব লাভ করিয়াছেন এবং বস্তুতই আপনাকে দর্শন করিয়া আমাদের দেবদর্শনের ফল হইয়াছে। কিন্তু দেবি! কিরূপে আপনার এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল?”

সুরমা বলিলেন,—

"শান্তিদেবীর এই রাজ্যে বিচিত্র ব্যবস্থা। এখানে কাহারও বা আগমনমাত্র পুনর্জন্ম হয়; কাহারও বা তাঁহাকে দর্শনমাত্র পুনর্জন্ম হয়; কাহারও বা শাসন-পুরীতে বিহারীর ন্যায় শাস্তি ভোগ করার পর, পুনর্জন্ম হয়। পুনর্জন্ম হইবার পূর্ব্বে, কালীকে শাসনপুরীতে বহুদিন বাস করিতে হইয়াছিল। শান্তিদেবী কৃপা করিয়া কালীকে বিনষ্ট করিয়াছেন; তাহার অন্তরাত্মা ধৌত করিয়াছেন।"

রমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমরা শাসন-পুরীতে যে বজ্র গম্ভীর শব্দে অলৌকিক আদেশ শ্রবণ করিয়াছি, সে শব্দ কাহার?"

সুরমা ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—

"তিনি ভগবান। শান্তিদেবীর কর্ম্মে ভগবান সহায়।"

তখন সুরবালা বলিলেন,—

"কিন্তু দেবি! আমাদের ভাগ্যে কি শান্তিদেবীর দর্শনলাভ ঘটিবে না? কোন্ পুণ্য ফলে সেই ভগবতীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে?"

সুরমা বলিলেন,—

"অবশ্য ঘটিবে। যে পুণ্যফলে শান্তিদেবীর সহিত সম্মিলন হয়, তাহা আপনাদের প্রচুর প্রমাণে আছে।"

সুরবালা বলিলেন,—

"তবে কোথায় তিনি? কোথায় গেলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব?"

সুরমা বলিলেন,—

"এই যে।"

তখন সেই কক্ষ মধ্যে জ্বলন্ত আলোক-প্রভ, হৈমময়ী, হসম্মুখী, শান্তিদেবীর আবির্ভাব হইল। তখন সুরবালা গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—

"কোন্ পুণ্যবলে, আমার সশরীরে ভগবতী সন্দর্শন ঘটিয়াছে। যাহার দিদি ভগবতী, না জানি তাহার কি অপরিসীম সুকৃতি!"

রমাপতি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—

"সুকুমারি। তুমি যে দেবত্ব লাভ করিয়াছ তাহা আমি অনেক দিন জানিতে পারিয়াছি। যে অধম এই ভগবতীকে এক সময়ে আমার বলিয়াছে, তাহার কি অপরিসীম পুণ্য? সুকুমারি! আমরা স্বর্গে আসিয়াছি; আর যেন এ স্বর্গ হইতে নরকে যাইতে না হয়; আর যেন আমাদের তোমার সম্মুখ হইতে কোথায় যাইতে না হয়।"

বহুক্ষণ নয়ন মুদিয়া গুরু-চরণ চিন্তা করার পর, শান্তি বলিলেন,—

"সুকুমারী বারো বৎসর পূর্ব্বে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

আমি শান্তি। আমি আপনাদেরই। যদি আমার সান্নিধ্যে আপনারা সুখী হন, তাহা হইলে ভগবান অবশ্যই আপনাদের সম্বন্ধে সুবিচার করিবেন। আপনারা দেব-দেবী। দেব-সেবাই এই স্থানের ব্যবস্থা। শান্তি আপনাদের দাসী।"

তখন মাধুরী ও খোকা খেলা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল এবং দুইজনে, কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, শান্তিদেবীর দুই হস্ত ধারণ করিল। তদনন্তর সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহারা সেই পবিত্রতাপূর্ণ সৌন্দর্য্যসার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মধুর হাস্য সহকারে সেই দেবী তাহাদের প্রতি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন খোকা বলিল—

"ধূ—ধূ! ঠাকুল—নয়?"

মাধুরী উত্তর দিল,—

"না রে, এ এক রকম দুগ্‌গা।"

খোকা তখন সুরবালার সমীপে আসিয়া বলিল,—

"মা মা, ডুগ্‌গা—জেন্ট—নলে!"

সুরবালা বলিলেন,—

"প্রণাম কর বাবা!"

খোকা প্রণাম না করিয়াই আবার সেই দেবীর নিকট আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিল এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল,—

"টুমি ডুগ্‌গা টাকুল?"

তখন প্রেমময়ী শান্তিদেবী, হাস্যমুখে মাধুরী ও খোকাকে উভয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়া, বলিলেন,—

“না বাবা, আমি তোমাদের আর একটা মা।”

যখন শান্তিদেবী উভয় অঙ্কে এই ভুবনমোহন শিশু-দ্বয়কে গ্রহণ করিলেন, তখন আর শোভার সীমা থাকিল না; প্রেমে সকলের কলেবর পুলকিত হইল। প্রেম-ময়ীর প্রেমলীলার তখন অভিনয় কি না!

তখন সুরমা বলিলেন,—

“ভগবতি! অনুমতি কর, আমার ছেলে মেয়েকে এই সুসংবাদ দিতে যাই!”

শান্তি বলিলেন,—

“চল সুরমে, আমরা সকলেই শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিতে যাই।”

তখন খোকা ও মাধুরীকে বক্ষে ধারণ করিয়া শান্তি-দেবী অগ্রসর হইলেন। তাঁহার একদিকে রমাপতি ও অপর দিকে সুরবালা চলিলেন। সর্ব্বশেষে সুরমা দেবী; সকলেরই দেহ কণ্টকিত— নয়নে প্রেমাশ্রু।

এইরূপে তাঁহারা সেই অতি সুবিস্তৃত ভবনের সুবি-স্তৃত প্রাঙ্গনপ্রদেশে অবতীর্ণ হইলে, হরিমন্দিরে দামামা বাজিয়া উঠিল এবং আনন্দ কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল; তখন দিব্যমূর্ত্তিধারী বহুতর দেব-দেবী, বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত হইয়া, শান্তিদেবীর পথাবরোধ

করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন শান্তিদেবী সেই শিশুদ্বয়কে অঙ্কে ধারণ করিয়া, মুদ্রিত নয়নে একান্ত মনে গুরুচরণারবিন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন সেই পুণ্যশ্লোক নরনারীগণ, শান্তি দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, অপূর্ব্ব স্বরসংযোগে ভগবতীর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দেবদেবীগণের স্তোত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানানন্দ যোগী সেই স্থলে সমাগত হইলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র দেবদেবীগণ, আন্তরিক ভক্তি সহকারে ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া, প্রণাম করিলেন। শিশুদ্বয়কে ক্রোড়ে লইয়াই শান্তিদেবী প্রণতা হইলেন এবং রমাপতি ও সুরবালা, ভগবান সম্মুখস্থ হইয়াছেন ভাবিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

"শ্যামসুন্দর তোমাদের মঙ্গল করুন।"

এই বলিয়া জ্ঞানানন্দ সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তাহার পর, অঙ্গুলি-সঙ্কেতে রমাপতিকে দেখাইয়া, শান্তিদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মা! এই পুরুষ তোমার কে?"

শান্তি বলিলেন,—

"প্রভো! এই পুরুষ আমার কেহই নহেন।"

তাহার পর সুরবালাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"মা! এই নারী তোমার কে?"

"প্রভো! এই নারী আমার কেহই নহেন।"

তাহার পর মহাপুরুষ আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"মা! তোমার ক্রোড়স্থ শিশুদ্বয় তোমার কে?"

"প্রভো! এই শিশুদ্বয় আমার কেহই নহে।"

আবার মহাপুরুষ জিজ্ঞাসিলেন,—

"মা! এই পুরুষ তোমার কে?"

"প্রভো! এই পুরুষ আমার সর্ব্বস্ব।"

"মা! এই নারী তোমার কে?"

"প্রভো! এই নারী আমার সর্ব্বস্ব।"

"মা! ঐ শিশুদ্বয় তোমার কে?"

"প্রভো! ঐ শিশুদ্বয় আমার সর্ব্বস্ব।"

মহাপুরুষ আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"তবে মা! বল শ্যামসুন্দর তোমার কে?"

শান্তি বলিলেন,—

"বুঝাইয়া বলিতে পারি না, কে? স্বতন্ত্ররূপে চিন্তা করিতে না পারিলে, স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি হয় না। শ্যামসুন্দর বুঝি আমার সকলই অথবা কেহই নহেন।"

মহাপুরুষ বলিলেন,—

"বৎসে! এ অসার সংসারে তুমিই সার। এ সংসারে যে তোমাকে চিনিয়াছে, সে সকলই চিনিয়াছে।

"ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধলক্ষণা।
লজ্জাপুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥"

তখন রমাপতি, মহাপুরুষের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন,—

"ভগবন্! এই শান্তি-নিকেতনে এ অধমদের স্থান হইবে তো?"

মহাপুরুষ বলিলেন,—

"তোমরা দেবতা। তোমাদের নিষিদ্ধ স্থান কোথায়ও নাই। কিন্তু তোমাদের কর্ত্তব্য এখনও অসমাপ্ত। অতএব বৎস, তোমাদের জন্ম আপাততঃ অনুরূপ ব্যবস্থা হইবে।"

সুরবালা, শান্তিদেবীর পার্শ্বে দাড়াইয়া, নীরবে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন।

মহাপুরুষ বলিলেন,—

"চল সকলে হরিমন্দিরে যাই।"

তখন মৃদঙ্গ, দামামা, করতাল, তুরী, ভেরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল এবং 'জয় শ্যামসুন্দরের জয়!' শব্দে দশদিক নির্ঘোষিত হইয়া উঠিল।

অগ্রে জ্ঞানানন্দ, তৎপশ্চাতে শান্তি, তৎপশ্চাতে রমাপতি ও সুরবালা এবং উভয় পার্শ্বে দেবদেবীগণ মিলিত হইয়া, সেই হরিমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্যামসুন্দরের অপরূপ রূপ দেখিয়া, রমাপতি ও সুরবালা বিমোহিত হইলেন।

তখন সেই মহাপুরুষ করজোড়ে অলৌকিক সুস্বরে গান করিলেন,—

"পীতাম্বরং ঘনশ্যামং দ্বিভুজং বনমালিন।
বর্হিবর্হাকৃতাপীড়ং শশিকোটিনিভাননম্॥
ঘূর্ণায়মাননয়নং কর্ণিকারবতংসিনম্।
অভিতশ্চন্দনেনাথ মধ্যে কুঙ্কুমবিন্দুনা॥
রচিতং তিলকং ভালে বিভ্রতং মণ্ডলাকৃতম্।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্॥
ঘর্ম্মাম্বুকণিকারাজদ্দর্পণাভ কপোলকম্।
প্রিয়ামুখার্পিতাপাঙ্গ লীলয়াচোন্নতভ্রুবম্॥
অগ্রভাগন্যস্তমুক্তা স্ফুরদুচ্চসুনাসিকম্।
দশনজ্যোৎস্নয়া রাজৎপক্কবিম্বফলাধরম্॥"

সেই মৃদুগম্ভীর সঙ্গীতধ্বনি সর্ব্বত্র আনন্দ ও পবিত্রতা বিকীরণ করিতে করিতে, শূন্যে মিশিয়া গেল। যে সৌভাগ্যবানের কর্ণকুহরে সে অপার্থিব ধ্বনি প্রবেশ করিল সে মহানন্দে মগ্ন হইল।

সঙ্গীত সমাপ্ত হইবামাত্র জ্ঞানানন্দ, করতালি দিতে দিতে, নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মানবের অক্ষম লেখনী শোভার পূর্ণচিত্র প্রদান করিতে অশক্ত। একে একে অন্যান্য দেববেদীগণ, রমাপতি, সুরবালা, এবং

মাধুরী ও খোকাও সেই নৃত্যে যোগ দিলেন। অহো! কি রমণীয়! কি হৃদয়োন্মাদকর! তখন নয়নজলে রমাপতি ও সুরবালার বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। নবজীবন প্রাপ্ত বিহারী, অভিরাম ও নারায়ণ, অলক্ষিত ভাবে সেই জনতার মধ্যাগত হইয়া, উভয় হস্তে তত্রত্য রজঃপুঞ্জ স্ব স্ব কলেবরে প্রলেপিত করিতেছেন। সেই মহাপুরুষ তখন প্রেমপূর্ণ স্বরে ডাকিলেন,—

"রমাপতি!"

রমাপতি উত্তর দিলেন,—

"দয়াময়!"

"তোমার প্রথমা স্ত্রী কোথায়?

"আমার সর্ব্বাঙ্গে। আমার হৃদয়, মন, দেহ, আত্মা সকলই শান্তিময়। সুকুমারী এখন শান্তিরূপে আমার প্রাণ শীতল করিতেছেন।"

"আর তাঁহার বিরহে তুমি কাতর নহ?"

"প্রভো! তাঁহার নিকটেই থাকি বা দূরেই থাকি, তাঁহার সহিত আর বিরহ হইবার নহে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সম্মিলন আমাদের কখন ছিল না। ভগবন্! আপনার কৃপায় আজি আমরা ধন্য হইয়াছি।"

তখন মহাপুরুষ বলিলেন,—

"তবে আইস শান্তি! আমরা কায়মনোবাক্যে তোমার পূজা করি। এ পাপ-তাপ-পূর্ণ বসুন্ধরায় কেবল

তুমিই একমাত্র নিষ্কাম ও উপাস্য। তোমার করুণা লাভ করিলে, জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না; ব্যাধি ও বৈকল্য থাকে না; জরা মরণ থাকে না। তুমিই আশ্রয়, তুমিই সুখ, তুমিই স্বর্গ। তুমি চিরদিনই সুকুমারী—তুমি চিরদিনই রমাপতির হৃদয়রত্ন—তুমি চিরদিনই সুরবালার আনন্দ-ধাম। প্রেমময়ি! কবে তোমার প্রেমে বিমোহিত হইয়া, বসুন্ধরার তাবল্লোক তোমার শান্তিনিকেতনে আশ্রয় গ্রহণ করিবে?"

"যথা নিত্যোহি ভগবান্ নিত্যা ভগবতী তথা।
স্বমায়য়া তিরোভূতা তত্রেশে প্রাকৃতে লয়ে॥
আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈবং কৃত্রিমম্।
দুর্গা সত্যস্বরূপা সা প্রকৃতির্ভগবান্ যথা॥
সিদ্ধ্যৈশ্বর্য্যাদিকং সর্ব্বং যস্যামস্তি যুগে যুগে।
সিদ্ধাদিকে ভগোজ্ঞেয়স্তেন ভগবতী স্মৃতা॥"

অতঃপর আমরা ব্রহ্মবাক্যে গ্রন্থ সমাপ্ত করি—

ইয়ং য়া পরমেষ্ঠিনী বাগ্দেবী ব্রহ্মসংশিতা।
যয়ৈব সসৃজে ঘোরং তেনৈব শান্তিরস্তু নঃ॥
ইদং যৎ পরমেষ্ঠিনং মনো বা ব্রহ্মসংশিতম্।
যেনৈব সসৃজে ঘোরং তেনৈব শান্তিরস্তু নঃ॥

ইমানি যানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি মনঃ ষষ্ঠানি

মে হৃদি ব্রহ্মণা সংশিতানি।

যৈরেব সসৃজে ঘোরং তৈরেব শান্তিরস্তু নঃ॥

—অথর্ব্ববেদ সংহিতা।

(পরব্রহ্ম সম্পাদিতা এই যে পরমেষ্ঠিনী বাগ্‌দেবী, যাঁহার দ্বারা বিপদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকি, তাঁহারই দ্বারা আমাদের শান্তি হউক।

পরব্রহ্ম সম্পাদিত এই যে পরমেষ্ঠী মন, যাহার দ্বারা বিপদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকি, তাহারই দ্বারা আমাদের শান্তি হউক।

পরব্রহ্ম সম্পাদিত এই যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মন, যাহাদের দ্বারা বিপদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকি, তাহাদেরই দ্বারা আমাদের শান্তি হউক।)

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সমাপ্ত।